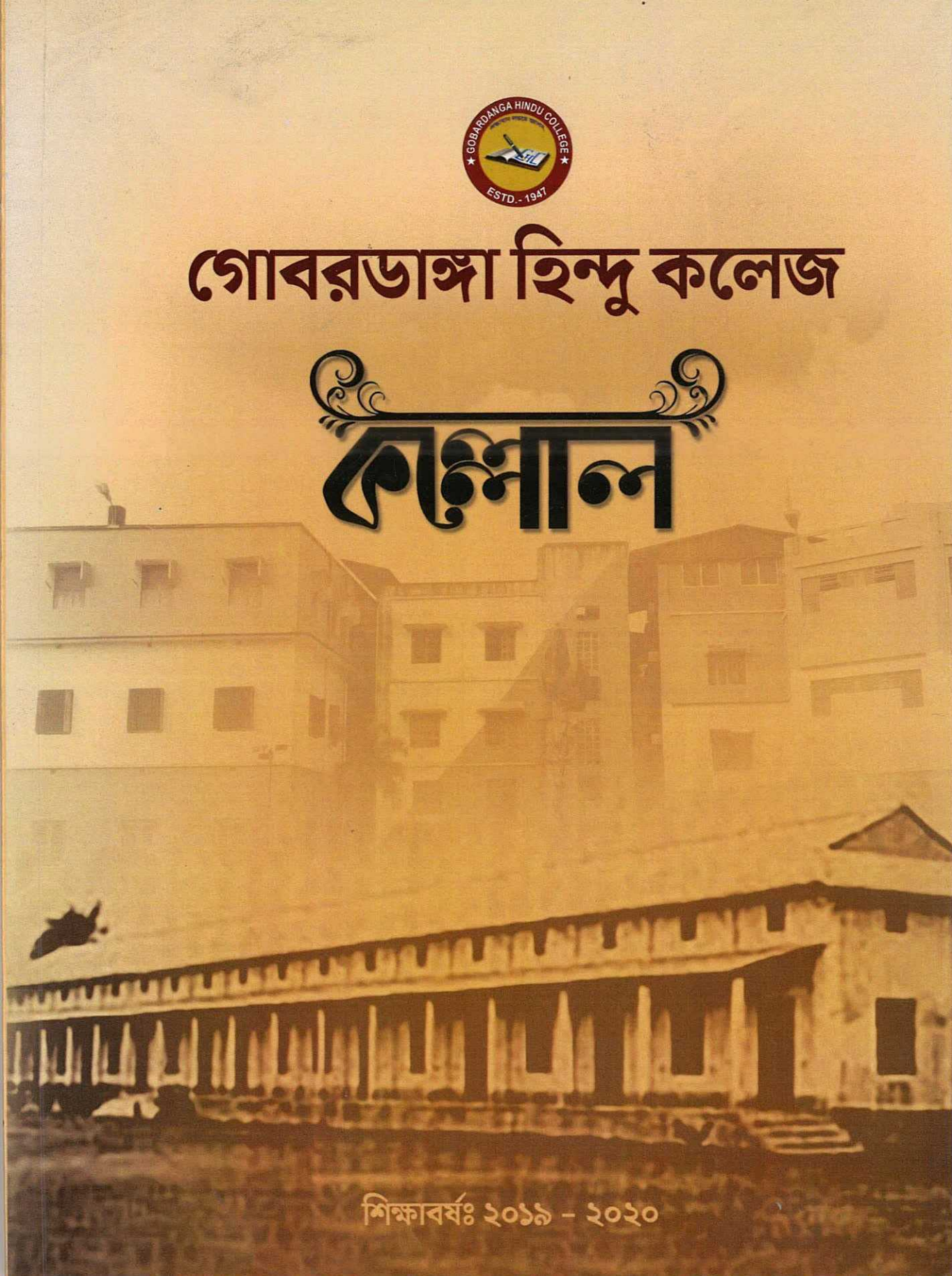

GOBARDANGA HINDU COLLEGE
ESTD. - 1947

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

কল্লোল

শিক্ষাবর্ষঃ ২০১৯ - ২০২০

International Seminar, Department of History & Economics, 2020.

Annual Sports Meet, 2020.

Principal's Meet-2020.

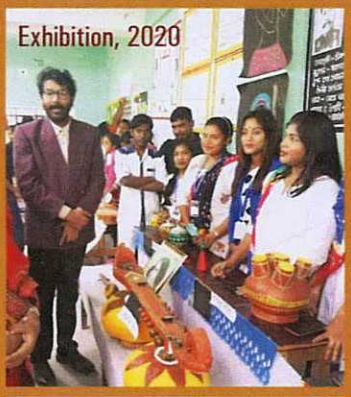

Exhibition, 2020

Annual Cultural Program, 2020.

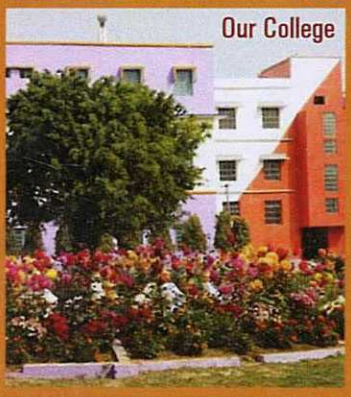

Our College

Youth Parliament competition District level champion and Divisional level 2nd 2019.

কৃষ্ণান

কল্লোল

গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

কল্লোল
২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

প্রকাশক:
ড. হরে কৃষ্ণ মণ্ডল
অধ্যক্ষ
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ, গোবরডাঙা

যোগাযোগ:
খাঁটুরা, গোবরডাঙা, উত্তর 24 পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- 743273
ফোন: 03216-249210
ফ্যাক্স: 03216- 276374
ই-মেল: gobhinducollegeday@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.ghcollege.in

সম্পাদকমণ্ডলী: পারমিতা দত্ত ,ড. ত্রিদিব মণ্ডল এবং সুদেব বিশ্বাস

প্রচ্ছদ: তুষার সাহা ও সুমন সাহা

অক্ষর বিন্যাস: গেটওয়ে গ্রাফিক্স, প্রফুল্লনগর, হাবড়া।

মুদ্রণ: সাহা গ্রাফিক্স, বাণীপুর, হাবড়া।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ৪
- সভাপতির বার্তা ৭
- অধ্যক্ষের বার্তা ৮
- শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের বার্তা ১০
- নারী, মহাদেব সরকার ১১
- মেঘ বলো, পায়েল দাস ১১
- মনের মানুষ চৈতালি দে ১২
- ভারতবর্ষ, শানু সাহা ১২
- ভারত সঙ্গমের ইতিকথা, উজ্জল আদিত্য ১২
- ভারতবর্ষ, সায়নী দাস ১৩
- ক্ষুধার্তের ক্ষুধা, ডলি সিংহ ১৪
- জ্ঞানের মশাল, শৌণক মুখার্জী ১৫
- বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদের বিবর্তন, বিশ্বজিৎ বাইন ১৬
- অন্তরে অন্তরে, সামিম মন্ডল ১৮
- কনট্রাস্ট, শশাঙ্ক শুভ্র সরকার ১৯
- মা, কেয়া মন্ডল ২০
- গোধূলি, কেয়া মন্ডল ২১
- বৈপরীত্য, চয়ন সরকার ২১
- অরুণ উদয়, চয়ন সরকার ২১
- গর্জে ওঠো, রিয়াঙ্কা সরকার ২২
- প্রেম-অভিসারিকা, দিশা হালদার ২২
- বাঁচার ইচ্ছা, সুস্মিতা সরকার ২২
- ক্ষুধিতের দাবি, সুস্মিতা সরকার ২৩
- জীবন, পায়েল মণ্ডল ২৩
- বর্তমান সমাজ, দীপা ঘোষ ২৩
- সময়, টুবাই মন্ডল ২৪
- উপলব্ধি, অভি চক্রবর্তী ২৫
- দীপাশ্রয়, তানিয়া চক্রবর্তী ২৭
- গল্পঃ স্মৃতি, প্রণব পাল ২৮
- বিদ্যাসাগর, সুস্মিতা সরকার ২৮
- ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন দর্শন ও তার বাস্তবতা, অভি চক্রবর্তী ২৯
- ভ্রম না সত্যি, পিয়ালী দেবনাথ ৩০
- নাটক: (অন্তঃসলিলা)ফল্গু, জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় ৩৩
- ফাগুন মাতন, জয়ন্ত মুখার্জী ৪৯
- সুখ, পিংকন বিশ্বাস ৪৯
- পরিণতি, পৌলোমী সেন ৫০
- অপূর্ণতার পূর্ণতা প্রাপ্তি, পৌলোমী সেন ৫১
- মোঘল রসুই খানার ঐতিহ্য পরম্পরা, লিপিকা ঘোষ রায় ৫৩
- বিশ্রুতি ও পুনর্জন্ম, জয়িতা সুর ৫৫
- রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীত্বের পালাবদল, জয়িতা সুর ৫৫
- প্রবচন, গৌরদাস সরকার ৫৯
- দুচোখে সমুদ্র, ড. লিপিকা বিশ্বাস ৬১
- আঘাত, সহদেব দাস ৬১
- চক্র, লোকনাথ সাহা ৬২
- ছায়া, ঊষা প্রসন্ন মন্ডল ৬২
- মজা নদীর উপাখ্যান, ঊষা প্রসন্ন মন্ডল ৬৩
- প্রক্ষেপ, সুদেব বিশ্বাস ৬৩
- সংরাগ, সুদেব বিশ্বাস ৬৪
- সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, ড: ত্রিদিব মন্ডল ৬৫
- বীরত্বের সম্মান, আকাশ মন্ডল ৭০
- নিঃসঙ্গতায় রবীন্দ্রনাথ-তিনটি গানের বিশ্লেষণ ড. প্রতীতি প্রামাণিক (দে) ৭০
- গল্প: "রাধারাণী", মিজানুর রহমান ৭৩
- Introducing Gobardanga Hindu College ৭৫

সম্পাদকীয়

সম্পাদকমণ্ডলী

পারমিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

ড. ত্রিদিব মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

একবিংশ শতকের উষালগ্নে যখন এই মিলেনিয়ামের দরজায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, তখন ছাত্র অবস্থায় আমাদের মধ্যে অনেকেই Y2K নিয়ে বেশ বিচলিত ছিলাম। কিন্তু Y2K ছিল একান্তভাবেই একটা যান্ত্রিক সমস্যা। নতুন মিলেনিয়াম, তথা শতাব্দী পেরিয়ে, কুড়ি বছর পার করে আজ আরও অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলি যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক মাধ্যম প্রভৃতির উপর আর নির্ভরশীল নয়। সমস্যা সমূহ খুঁজলে দেখা যাবে নিতান্তই আজ সকলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ক্রমেই একাকীত্ব বাড়ছে আর তার সাথে বেড়ে চলেছে Social Media -র প্রভাব। ঘরের ভেতরে ভাইবোন এখন খুব কমই খুনসুটি করে। সবাই বড় ব্যস্ত। একে অপরকে বিরক্ত না করে, কারোর সাথে কথা বলে শব্দদূষন না বাড়িয়ে চলেছে নীরব কথোপকথন। Virtual World আমাদের বড়ই আপন। কারোর জন্মদিনে দৌড়ে তার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ি না। বরং কয়েকটি সুন্দর কেকের ছবি তুলে পাঠিয়ে দিই বন্ধুকে। কেকের সুগন্ধ নেই, কিন্তু অজানা কোন এক ছবি উপস্থিত আছে। দায়সারা জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা কি করে যে আমাদের মৌন করে রেখেছে তা বিজ্ঞান বলতে পারবে কি?

নতুনত্বের আঙিনায় পুরাতন কি একান্ত ব্রাত্য? না কি নতুন বলে আর কিছুই নেই? মানুষের চিন্তাধারা আবহমান কাল থেকে যে গতিতে এগিয়েছে, সেই গতি কি হঠাতই রুদ্ধ? রুদ্ধ দরজা খুলবে কে? সবাই তাকিয়ে থাকি নতুন প্রজন্মের দিকে। যে প্রজন্ম Postmodern ও অনেকেই বলছেন Post-human। কিন্তু প্রশ্ন মনে আসে আর কতগুলি 'Post' জুড়তে হবে আগামী দশ বছর পর? নাকি আবার অকৃত্রিম, অনাবিল ও আদিম যুগের জন্যে প্রস্তুতি নেব সকলে? সূর্য মরে যাবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন সূর্যের রশ্মি আরও শত-সহস্র বছর নাও সভ্যতাকে বাঁচিয়ে

রাখতে পারে এবং আরো সকল জীব জগৎকে। Dark Hole বা Black Hole যা সবকিছুকেই গ্রাস করে থাকে, এই যান্ত্রিকতা, Posthuman বা Postmodern চিন্তাধারা, ধরে নেওয়া যাক একাকীত্বকেও হয়তো শুষে নেবে। তাহলে নতুন পৃথিবীর প্রয়োজন। যতক্ষন না নতুন পৃথিবী পাই এই পুরাতন পৃথিবীকে সতেজ, সজীব, প্রাণোচ্ছল রাখাটাই মূল উদ্দেশ্য। তারই প্রয়োজনে সৃজন ও শিল্প যা মানুষকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে তেমনি কাজকর্মের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখি।

কল্পনা শক্তির দ্বারা কবি T.S. Eliot লিখছেন—

"…… I was neither
Living nor dead, and I knew nothing,
Looking into the heart of light, the silence…… "

(*The Wasteland , 1922*)

সুচিন্তার অবসান বোধহয় হয়নি। জীবনের ধর্মে সেটি ভাস্বর হয়ে থাকবে।

গোবরডাঙা হিন্দু কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা "কল্লোল", আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক বৃন্দ ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টায় সুদূর প্রসারী এক পথ দেখিয়ে দেবে, এই কামনায় পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি হোক এই আশা রাখি।

নমস্কারান্তে—

পারমিতা দত্ত
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজী বিভাগ

ড. ত্রিদিব মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

‘কল্লোল’ পত্রিকার উপ-কমিটি
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

১) ড. লিপিকা বিশ্বাস
২) ড. ত্রিদিব মণ্ডল
৩) ড. উৎপল কুমার মণ্ডল
৪) অধ্যাপক প্রবীণ সিকদার
৫) অধ্যাপিকা সঙ্গীতা রায়
৬) অধ্যাপিকা পারমিতা দত্ত (আহ্বায়ক)
৭) অধ্যাপক বিশ্বজিৎ সাহা
৮) ড. স্মৃতি সরকার
৯) ড. ব্রজগোপাল চাদ
১০) অধ্যাপক দিনা দাস
১১) অধ্যাপক সুদেব বিশ্বাস
১২) অধ্যাপক নিলয় সরকার
১৩) অধ্যাপক কৃষ্ণকান্ত ঢালি

সভাপতির বার্তা

সুভাষ দত্ত
সভাপতি
পরিচালন সমিতি
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

ষাটের দশকের শেষ কয়েকটি বছর ও সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে এই কলেজে আমি ছাত্র অবস্থায় কাটিয়েছি। বর্তমানে আমি এই কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি। যোগাযোগের ধরণটা ভিন্ন হলেও সম্পর্কটা কিন্তু অটুট রয়ে গেছে। গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ প্রায় ৭৩ বছরের বেশী সময় অতিক্রম করে আজকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ব্যাপ্তিতে আরও বিস্তৃত হয়েছে। কলেজের এই সোনালী সময়ের দিনগুলি আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন। ব্যস্ত সময়ের অন্তর্জাল ছিন্ন করে মননশীল চিন্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে কলেজের পত্রিকা 'কল্লোল'। প্রবাহমান সময়ের স্রোতে আধুনিকতার মূল বাণী ধ্বনিত হয়েছে পত্রিকাতে। বৈচিত্রের মধ্যেও ঐক্যের সুর বিরাজমান। এই 'কল্লোল' পত্রিকার সংস্করণ কলেজের বহুবিধ প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছে। আশা করি আগত সময়েও এই রকম চিন্তাশীল ও মননধর্মী পত্রিকার প্রকাশ কলেজকে আরও সমৃদ্ধ করবে। আমি সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

'কল্লোল' এর প্রতিধ্বনি নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে এই আন্তরিক কামনায়।

শুভেচ্ছা সহ—
আপনাদের
'সুভাষ দা'

Principal Message

Dr. Hare Krishna Mandal
Principal
Gobardanga Hindu College)

In a wholehearted attempt to pursue the mission and vision of the college, we, the teachers, non teaching staff and students are committed to fulfilling of our primary aim of reaching out to the masses in the wider realm of higher education and of enlightening even those not directly associated with the institution. The publication of the cultural magazine "Kallol" is an integral part of that enterprise. It has a larger social significance other than its inseparable and pertinent connections with the socio academic aspects.

I had been a student of Economics honours at this very same institution a couple of decades ago and today I serve as the Principal of this college. Numerous change have already been wrought in especially in the functiong, operation and distribution of work, to ensure effiency. Students have increased in large numbers and there is hardly any vacancy for most subjects at Gobardanga Hindu College. Such an overwhelming response in mass education may be owed to a number of factors. Classes are held most regularly, and the college targets to hold 100 present classes for each and every single student. Infrastructural facilities are made easily accessible to all. The geographical location of this instituition has been of great advantage as always. Teachers, members of the staff and students (both past and present) make equal contributions to the unique ambience of the college.

"Kallol", the cultural magazine of the college, published on an annual basis portrays at least partially (though not slightly) the unending zeal of all stakeholders concerned. As you will discover, poems, short stories, plays and original photographs, feature in this volume. It is a matter of great wonder to observe that in spite of much criticism levelled against the contemporary generation w.r.t. their overt and rather

blatant attraction for digitized prototypes, the creative muse lives on. Inspiring originality and innovation, "Kallol" progresses forward most successfully.

A special word of thanks is owed to all the members of the maganize sub-committee for their active support. And last but not the least to our President of the governing body, Shri Subhas Dutta, who has been a rock and fortress for us in the best and worst of times.

Wishing "Kallol" every success,

Thanking You,
Dr. Hare Krishna Mandal

শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের বার্তা

কৃষ্ণকান্ত ঢালী
সহকারী অধ্যাপক
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদকের পদে থাকার কারণে আমি কিছু উত্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি। এই পত্রিকাটি প্রধানত ছাত্রদের আগ্রহে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। কল্লোলের এই সংস্করণ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে কিছু নবীন চিন্তা ধারার সমন্বয়ে। কৃত্রিমতার বেড়াজাল ভেঙে এই সংস্করণের লেখনীগুলি লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির স্পর্শে আপনাদের নিকট সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে এই আশা রাখি। পরবর্তী সংখ্যাগুলি আরও উন্নত এবং আরও সৃজনশীল ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে ও পাঠকের মনোগ্রাহী হওয়ার পথকে সুগম করবে, এই কামনায় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কৃষ্ণকান্ত ঢালী
সহকারী অধ্যাপক
গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ।

নারী

মহাদেব সরকার
এম.এ. প্রথম সেমিস্টার (শিক্ষাবিজ্ঞান)

'নারী'—নারী মানে দেবী,
নারী মানেই দশভূজা;
নারী মানে বিশ্ব মাতা,
নারী মানেই সৃষ্টির আঁধার।

ওরেঃ কাপুরুষের দল,
নেই কী তবে লজ্জা!
রাতের অন্ধকারে নষ্ট করিস,
নারীর রুপসজ্জা!

ওরেঃ ওরে হতভাগা মনে রাখিস—
নারী মানেই লালসার শিকার নয়;
নারী মানে কারো মা—কারো বোন,
নারী মানেই কারো হৃদয়—কারো জীবন।

হেঃ নারীর দল,
নেই কী তবে মনোবল?
আর কতদিন রইবে পিছে?
স্বাধীন জীবনে তোমারও সমান অধিকার আছে।

উচ্চ করি শির, হস্তে ধরিয়া তীর;
নষ্ট করো কাপুরুষের পুরুষত্ব,
জাগিয়ে তোল মানুষের মনুষ্যত্ব।
নারী তুমি দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও;
তুমি দুর্বল নও।

নারীরা পারে লড়াই করতে,
নারীরা পারে ক্ষমা করতে;
তাই নারী মমতাময়ী, মায়ের জাত,
নারী জগৎস্রষ্টা, নারীই শ্রেষ্ঠ জাত।।

মেঘ বলো

পায়েল দাস
এম.এ. প্রথম সেমিস্টার (শিক্ষাবিজ্ঞান)

মেঘ বলল যাবি,
অনেক দূরের গেরুয়া নদী,
অনেক দূরের এলাকা পাহাড়,
অনেক দূরের গহন শিমুল,
গেলেই দেখতে পাবি, যাবি?
আমার সঙ্গে যাবি?
দিন ফুরিয়ে রাত ঘনাবে,
রাত্রি গিয়ে সকাল হবে,
নীল আকাশে উড়বে পাখি,
গেলেই দেখতে পাবি, যাবি?
শ্রাবণ মাসের একলা দুপুর,
মেঘ বললো যাবি, আমার সঙ্গে
যাবি, কেমন করে যাবরে মেঘ,
কেমন করে যাবো?
নিয়মে বাঁধা জীবন আমার,
নিয়ম ঘেরা এধার-ও ধার
কেমন করে নিয়ম ভেঙে-এ
জীবন হারাবো।
কেমন করে যাব রে মেঘ—
কেমন করে যাব?
মেঘ বললো, দূরের মাঠে—
বৃষ্টি হয়ে ঝরবো,
সবুজ পাতায় পাতায় ভালোবাসা হয়ে ঝরবো,
শান্ত নদীর বুকে আনব জলস্রোতের প্রেম,
ইচ্ছেমতো বৃষ্টি হয়ে ভেঙে পড়বো
এই মেয়ে, তুই যাবি আমার সঙ্গে, যাবি?
যাব না মেঘ, পারবো না যেতে,
আমার আছে কাজের বাঁধন, কাজেই থাকি মেতে
কেবল যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখনই যায় সীমার বাঁধন ডিঙিয়ে
দৌড়ে এক ছুটে পালায়।...

মনের মানুষ

চৈতালি দে
স্নাতকোত্তর বিভাগ, ১ম বর্ষ (শিক্ষাবিভাগ)

তার জন্য আছি বসে সিন্ধু তরণীর পাড়ে
ঘন পল্লব ঘেরা বৃক্ষের দ্বারে।।
স্তব্ধতায় বসে আছি একা ভূপৃষ্ঠের কোলে
কোথা থেকে উড়ে এলো পাখিরা দলে দলে।।
তাদের কলরবে মনটা যেন কোমল হয়েছে
অন্তঃসত্ত্বা আজ তাদের সহিত মিশেছে।।
এলো ঘনিয়ে বেলা একে একে গেল সব নীড়ে
বসেছিলাম শূন্যের দিকে চেয়ে প্রকৃতির ভিড়ে।।
গোটা দিবা রাত্র হলো সবশেষ
সারাটা দিন তাদের আদরের দ্বারা ছিলামতো বেশ।।
তারপর মনে হলো পেলাম আমি স্বর্গসুখ
প্রকৃতি তুলেছে আমার দিকে মুখ।।
অনুভূতি হল সেই মানুষ ছিলো মনের কাছে
অযথা বেকার ঘুরে বেরিয়েছি প্রকৃতির পাছে।।

ভারতবর্ষ

শানু সাহা
সাম্মানিক(বাংলা), তৃতীয় বর্ষ

'ভারত বর্ষ মানে বহুমতের মিলনতীর্থ
এদেশে জন্মে মোর ভরিল চিত্ত'

সেই সুর সুরলোকের দরজায় ধর্মান্ধতার শিকল খুলে
মালার মতো ফাটছে করিমের আজন্ম পিপাসিত কণ্ঠে

বিভেদের দরজার উল্টোপথে পা বাড়ালেন মীরা
ফকিরি পয়সার মতো কুড়িয়ে নিলেন মুসলমানি শিশু
রাজধানীর সবচেয়ে সুন্দরী পরীর মাথায় তখন মেঘ—
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের মজলিশ।
সেই মজলিশে বাঁশিতে মিলনের ফুৎকার দিলেন বিসমিল্লা...
প্রজাপতি যৌবনা কিশোরীর কোলে রক্তমাখা শিশু
কপালে তিল অশোক চিহ্ন,
সদ্য প্রস্ফুটিত স্তনে ফুটন্ত ভাতের গন্ধে ঘুম আসেনা ছেলের।
ধর্ম-বিভেদ-মতানৈক্য নামের দরজায় দরজায়
যে আয়না-বতী ফুলওয়ালি মাথা কুটে মরে।
তার একাদশতম গর্ভে লাথি মারে কুসংস্কার।
এতকিছুর পর জাগলেন ধ্যানমগ্ন তাপস
তার হাতে গেরুয়া-সাদা-সবুজ রঙের অঙ্গরাগ
উজ্জ্বল সেই অঙ্গরাগে
আপন মনে আঁকেন মানচিত্র;
অখন্ড মানচিত্র-মানদণ্ড-মতানৈক্য...
আঁখিপল্লব জুড়ে তার নেমে আসে উপত্যকা
ঘুমন্ত শিশুর শিয়রে রণক্লান্ত সৈনিকের পদযাত্রা,
ন'শো উননব্বই জন সেপাইয়ের কুচকাওয়াজ শেষে
ধুলোয় স্বর্গে আবার ঘুমিয়ে পড়ে উলঙ্গ শিশু।
জনমত নামের যে সুদীর্ঘ গৌরব তার অভুক্ত পেটে তারই স্বপ্নে।
বিটপগর্ভা জননীর পাশে অর্ধচক্ষু উন্মিলিত দেশ।

ভারত সঙ্গমের ইতিকথা

উজ্জল আদিত্য
বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ

সেঁজুতি হাতের সিন্ধুবালিকা,
শক্ত পাথর ঢেকে গেছে ঘাসে
সাত্বিক ঔরসে।

অঙ্গরূপের গুহ্যকথায় রক্তরা চাপ চাপ,
প্রসব-ছন্দে হিল্লোল-উদ্ভাস।

নতজানু কুন্তী মহারানি জটায়ু-বিবেক-ভাষায়
চারপুত্রের নিঃসন্তানা মা—
আমার ভারতভূমি যেমন
বিষাদ রজঃস্বলা!

জরায়ু-গর্ভ ভারী হয়ে ওঠে কত মতবাদে,
কত না প্রতিশ্রুতি!
ধ্বংসের স্বপ্ন দেখা ব্যক্তবীজী মনে
চলছে মায়ের বিবিধ সঙ্গম।

হোক না জারজ, সন্তানবতী সে।
রীতির জনম, মায়ের মিলন
আরও আরও যন্ত্রনা। তবুও
মা সে, কুমারী প্রতিম বিধবা বেহুলা।

রক্তের স্রোত ঝর্ণার মতো
চাঁদ ছুঁতে চাওয়া নদী।
আজীবন সে কুমারী ভারত—
অজস্র সন্ততি।

নিবিড়তাহীন সামঞ্জস্য, একঘেয়ে
ঘাস ছিঁড়ে
উন্মুক্ত তার গোপন ভাঁটফুল।
অটল করুণা গড়িয়ে নামছে
ভিজে ভিজে কেশদামে—
প্রসূতি-লগ্নে বেজন্মা মতবাদ।

আমরা তবুও ভাই—
মায়ের মূর্তি ধূপে সুবাসিত।
পতাকা যখন পাঁজরের নীচে ওড়ে
থেমে যায় সব উত্থিত অক্ষর।
বেঁচে থাকে শুধু সন্তানবতী মা—
মা, শুধু মা।

ভারতবর্ষ

সায়নী দাস
বিএ, ইংরেজি (সাম্মানিক)

'ভারতবর্ষ মানে বহুমতের মিলনতীর্থ
এদেশে জন্মে মোর ভরিল চিত্ত'

উল্লিখিত লাইনগুলি থেকে প্রথমেই আমার ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটাই লাইন মনে পড়ে—

'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'

ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। এখানে বহু ভাষাভাষির মানুষ সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে। এমন এক দেশ যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকে অনন্য, বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি, লেখক এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। নিজেদের বহুমুখী প্রতিভা দিয়ে এই দেশকে আরও গৌরবময় করে তুলেছেন। বহু ঐতিহাসিক দেশপ্রেমী, গায়ক-গায়িকা অবস্থান করছেন। তাদের জন্ম ও প্রতিভা আমাদের দেশের খ্যাতি বাড়িয়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখদের মত মহান ব্যক্তিত্ব দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। দেশের প্রতিটি কোনায় কোনায় রয়েছে সম্প্রীতি। নীতিবোধ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ছাপ যা দেখে সত্যিই গর্ব হয় নিজের। এই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ তার 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় বলেছেন যে—

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর'

এই সমস্ত অমর কীর্তিগুলি প্রতিটি মানুষের কাছে গৌরবময় হয়ে থাকবে চিরকাল। হিন্দু মুসলিম দুই ভিন্ন ধর্মের মিলনক্ষেত্র এটি। বহু পুরনো একটি কবিতায় আমরা পেয়েছি—

'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম
হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ'।

উল্লেখিত লাইনটি আমাদের মনের মধ্যে এক অপরূপ

প্রভাব ফেলে। ভিন্ন ধর্ম হলেও তাদের মিলন দেখে সত্যিই অভিভূত হই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। আমাদের দেশের ভারতমাতার সম্মান রক্ষার্থে নেতাজি, গান্ধিজি, ভগৎ সিং, মাতঙ্গিনী হাজরা, নজরুল ইসলাম বহু মহান ব্যক্তিত্ব প্রাণ দিয়েছেন। শহীদ হয়েছেন। নেতাজির সেই মহান উক্তি এখনও কানে বাজে—

'তোমরা আমাকে রক্ত দাও
আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব'

ক্ষুদিরাম বসুর সেই মহান উক্তি ফাসিঁকাঠে ঝোলার আগে—

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী'।

ভারতবাসীর প্রতি স্বামীজির মহান উক্তি -

'সমস্ত মুচি, মেথর, সকল ভারতবাসী
আমার রক্ত, আমার ভাই'

এত বড় বড় উদার মানসিকতার ব্যক্তিগণ আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং দিয়েছেন বিভিন্ন বাণী, যা ভারতবাসীকে বিভিন্ন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যা থেকে মানুষ পেয়েছে নতুন করে বাঁচার উপায়।

বৌদ্ধদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ, জৈন ধর্মে মহাবীর, পার্শ্বনাথ প্রমুখ মানুষজন তাদের ভালত্বের উপদেশ দিয়েছেন। যার ফলে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি এত মতের মিলনক্ষেত্র কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কোন দেশ হতে পারে না।

আমি নিজে একজন বাঙালি, এদেশের এত বহুমুখী প্রতিভা আর অন্য কোন দেশে হয়তো পাওয়া যাবে না। নিজের দেশের প্রতি আমি গর্বিত। এই দেশের এত গুণাবলী যে বলে শেষ করা যাবে না। নিজের প্রতিও আমি গর্বিত। আমি নিজের দেশকে ভালবাসি, নিজের দেশের ভারতমাতাকে সম্মান করি। দেশের প্রতি প্রাণদায়ী সেই মহান ব্যক্তিত্বদের আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাতে চাই যাদের জন্য আমাদের দেশ দীর্ঘ ২০০ বছর অত্যাচারী ইংরেজ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ভারতবাসী পেয়েছিল নতুন বাঁচার রসদ, বেঁচে থাকার উপায়। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিত্বের জন্যই দূর হয়েছিল বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথার মত কদর্য প্রথা।

সবশেষে একটা কথাই বলতে চাই যে,—

'এদেশে জন্মে মোর ভরিল চিত্ত' এই কথাটি ১০০% খাঁটি এবং আমি নিজে একজন ভারতবাসী হয়ে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। তাই বুক ঠুকে নির্ভয়ে একটা কথাই বলতে পারি— হ্যাঁ, আমি ভারতবাসী, আমি গর্বিত আমি ভারতবাসী...।

ক্ষুধার্তের ক্ষুধা

ডলি সিংহ
রোল নং-১০, ১ম সেমিষ্টার,
স্নাতকোত্তর (বাংলা বিভাগ)

রাজড্রেনে ভিড় জমেছে এ কি কোলাহল
উঠবে চাবুক আসবে সেপাই পালাবি কোথায় বল?
দূরবীক্ষণে অনাহার দেখে মাহাত্ম্য খোঁজে
ফুটপাতের বাসিন্দা তার কিবা কদর বোঝে!
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে হাসিতে প্রাণ দেবো
উপহারে বাড়িতে বাড়তি ফ্যানটুকু পাঠিও।
ক্ষুধার্তের ক্ষুধা শুধু ক্ষুদার্তই বোঝে
মোরগের বদলে সুখ প্রজার মরণে।

জ্ঞানের মশাল

শৌণক মুখার্জী
ক্রমিক নং-০১, শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

"রাজু! অ্যাই রাজু! কুথায় গেলি বাপ?" রাজুর ঠাকুমার চিৎকারে সারা পাড়া জেনে যায় রাজুকে খুঁজে পাচ্ছেনা তার বুড়ি ঠাকুমা। আর, পাবেই বা কি করে; সে বেচারা হয়তো এখনও বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ বিলি করার যে নতুন কাজটা করছে ইদানিং সেটা সেরে হয়তো এখনও বাড়ি ফেরেনি। রাজুর বাবা-মা নেই। ঠাকুমাই তাকে মানুষ করছে কষ্ট করে।

তবে, ছেলেটা খুবই মেধাবী। অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে, তারপর কাকভোরে উঠে খবরের কাগজ বিলি করে বাড়ি ফেরে। তারপরে, কোন রকমে স্নান সেরে কোনদিন পান্তা, কি কোনদিন দুটো মুড়ি খেয়ে কলেজে যায়। ছেলেটাকে আমার বেশ লাগে। ঐ কলেজের অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে ও আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে সমস্যায় পড়লে। আমিও সাধ্য মতো ওকে সাহায্য করি।

আজ কলেজে খুব তোড়জোড় চলছে। কারণ, আজ এই কলেজে অধ্যাপক হিসাবে আমার চাকুরি জীবনের শেষ দিন। তাই আমাকে কলেজের তরফ থেকে ফেয়ারওয়েল দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানের পর্ব মিটে গেলে বিভাগে গেলাম। সেখানে যেতেই আমার সহকর্মীরা ও ছাত্র-ছাত্রীদের সবাই উপস্থিত হয়েছে দেখলাম— প্রাক্তন, বর্তমান কেউ-ই বাদ নেই। তারা সবাই মিলে আমাকে বলল— "স্যার' আমাদেরকে ভুলে যাবেন না, যোগাযোগ রাখবেন।"

আমি ধরা গলায় তাদের বললাম— 'অবশ্যই রাখবো। আর, তোমরাও নিজেদের আদর্শের পথে অবিচল থেকো।"

বেশ কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটিয়ে বিভাগ থেকে বেরোতে যাচ্ছি, হঠাৎ একজন সুদর্শন যুবক এসে আমাকে টিপ করে একটা প্রণাম করলো। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই আমার সহকর্মী মৃগাঙ্ক বললো— "স্যার, ইনিই আপনার জায়গায় নতুন অধ্যাপক হিসাবে এই বিভাগে জয়েন করছেন। এনার নাম রাজদ্বীপ মৈত্র।"

ছেলেটিকে কেমন যেন চেনা চেনা মনে হলো। আমি ওকে বললাম— 'কোথায় যেন দেখেছি তোমায়— ঠিক মনে করতে পারছি না।' তখন এক গাল হেসে ছেলেটি উত্তর দিল— "স্যার, আমি রাজু।"

আমি চমকে উঠলাম। রাজু?! সেই হতদরিদ্র ছেলেটা! যে কাকভোরে উঠে সবার বাড়ি খবরের কাগজ বিলি করতে যেতো! গরীব হওয়ার কারণে সবার অবহেলার পাত্র ছিল— সেই রাজু আজ অধ্যাপক রাজদ্বীপ মৈত্র!! সত্যিই অবিশ্বাস্য! বিস্ময় কাটিয়ে বললাম— 'ঠাকুরমা মারা যাওয়ার পর তুমি যে জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে, তাতে শেষপর্যন্ত তুমিই জিতলে রাজু! খুব ভালো।'

রাজু বললো— 'স্যার, সবই আপনার আশীর্বাদ। আশীর্বাদ করুন আমি যেন আপনার দেওয়া শিক্ষার মান রাখতে পারি।'

আমার চোখে জল এসে গেলো— মনে হলো আজ শিক্ষক হিসাবে আমার জীবন স্বার্থক হলো। আমার জ্ঞানের মশালটা আমি তুলে দেওয়ার জন্য একজন যোগ্য মানুষকে পেয়ে গেছি। রাতে বেশ এক বুক প্রশান্তি নিয়ে ঘুমোতে গেলাম। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখলাম সেই রাজুকে— তার এক হাতে বই, অন্য হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল—

সে দৌড়াচ্ছে—আর তার পিছনে দৌড়াচ্ছে অগণিত মানুষ। হঠাৎ কোথা থেকে যেন বেজে উঠলো রাজুর ঠাকুরমার গলা—'রাজু! কুথায় গেলি বাপ?' আর, রাজু উত্তর দিল—

" চিত্ত যেথা ভয় শূণ্য,/ উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত,/ গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ তলে/ দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই/ খণ্ড ক্ষুদ্র করি।"

বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদের বিবর্তন

বিশ্বজিৎ বাইন
সাম্মানিক

"বাঙালি আজ লজ্জা পায় ধুতি পরে চলতে।
বাঙালি মজেছে আজ বুট হ্যাট কোটে।"

সত্যিই তাই। পোষাকের সাথে আবহাওয়ার সম্পর্ক থাকলেও আমরা বাঙালিরা এই গরমের দেশে নিজেদের 'Smart' প্রমাণ করার চেষ্টায় শীতের দেশের বুট, হ্যাট, কোট পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি ধুতি-পাঞ্জাবির তুলনায়। আজ পোশাকের বৈচিত্র্য এবং পোশাকের ডিজাইনের বৈচিত্র্য থাকলেও পোশাকের 'বেসিক' চিন্তাভাবনা এক। ইউরোপিয়ান আদলে একটু এদিক ওদিক করা। তাই তার নামও ভিন্ন ভিন্ন। কোনোটা বাহা শাড়ি, কোনোটা জামদানি, বেনারসী শাড়ি, কোনোটা আবার ঝিলিক চুড়িদার। কোনোটা জহরকোট, বুম্বা কোট, ব্লেজার, প্যালাজো, ল্যাহেঙ্গা, ফ্রক ইত্যাদি।

বর্তমান একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শুরুতে বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হলেও শ্রুতিগোচর প্রাচীন বাঙালির পোশাক কেমন ছিল? সে সম্পর্কে আমাদের মন আজও সমান কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের তথ্যের দিকে।

বাঙালির জীবনকাল খ্রিস্টপূর্ব প্রায় তিন হাজার বছর আগে শুরু হলেও আমরা মোটামুটি চর্যাপদের কিছু পূর্ব এবং সমসাময়িক কাল থেকে বাঙালির পরিচয় ঠিকঠাক ভাবে পাই। চর্যাপদের মধ্যে আমরা বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদের বিবরণ না পেলেও সমসাময়িক কাশ্মীরি কবি ক্ষেমেন্দ্র-র 'দশোপদেশ' গ্রন্থ এবং বিভিন্ন লেখমালা থেকে আমরা মোটামুটি এই রকম ধারণা করতে পারি।

সেলাইবিহীন ধুতি ও শাড়ি ছিল প্রাচীন বাঙালির প্রধান বেশ। নানা রকম ফলফুল ও জ্যামিতিক নকশা করা উত্তরীয় এবং ওড়না ব্যবহার করত অভিজাত পরিবারের নারী-পুরুষেরা। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে পোশাকও ছিল আলাদা। নর্তকী মেয়েরা পরত পায়ের কাছে গোছ অবধি আঁটসাঁট পাজামা, দেহের উত্তরার্ধে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দিতেন লম্বা ওড়না। সন্ন্যাসী তপস্বীরা এবং একান্ত দরিদ্র সমাজের মানুষ এবং শ্রমিকেরা পরতেন ন্যাঙ্গোট। শিশুদের পরনে থাকত আজানুলম্বিত আঁট পাজামা এবং তাদের গলায় ঝুলত এক বা একাধিক সূত্রাহার।

পুরুষের লম্বা বারবির মতো চুল রাখত। কখনো থোকা থোকা করে কাঁধের ওপর রাখত, আবার কখনও রাখত চুড়ো করে বেঁধে। সন্ন্যাসী তপস্বীদের লম্বা জটা দুধাপে মাথার উপর জড়ানো থাকত। শিশুদের চুল তিনটি 'কাকপুচ্ছ' গুচ্ছেমাথার ওপর থাকতো বাঁধা। যোদ্ধারা, পাহারাওয়ালারা পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢাকা চামড়ার জুতো পরত। তবে অভিজাত বাড়ির লোকেরা পরত কাঠের তৈরি খড়ম।

প্রাচীন বাঙালি মেয়েদের শৌখিনতা কম ছিল না। চোখে কাজল, কপালে কাজলের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর পায়ে আলতা ঠোঁটে সিঁদুর, গায়ে আর মুখে মাখত চন্দনের

গুঁড়ো আর চন্দনের পঙ্ক। মৃগনাভি, জাফরান প্রভৃতি ব্যবহার করত। তবে অভিজাত বাড়ির মেয়েরা উত্তরাপথের আদর্শকেই মেনে চলত। কর্ণকুন্তল, কর্ণাঙ্গুরিয়, কণ্ঠাহার বলয়, শঙ্কবলয়, মেখলা এসব অলংকার পরত অভিজাত পরিবারের নারীরা। নিম্নবিত্ত ঘরের নারীরা প্রকৃতির নানা উপাদান নিয়ে তৈরি যেমন কচি-কলাপাতার কর্ণাভরণ ইত্যাদি পরত। তবে এদের শঙ্খ বলয় পরবার সুযোগ ছিল।

মধ্যযুগের প্রথম পর্বে রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নব গৃহবধু রাধার পরনেও ছিল শাড়ি। নব ত্রয়তির চিহ্ন হিসাবে বড়ু

চন্ডীদাসের রাধা—'কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।" মুসলমান শাসক এবং মোগল রাজাদের পোশাকের প্রভাব বাঁচিয়েই ধুতি ও শাড়ি বেঁচে থাকার প্রমান পাই মঙ্গলকাব্য গুলিতে। বাঙালি মায়েরা যতটুকু পেলে খুশি হত তা ভারী সুন্দর করে কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে ব্যক্ত করেছেন।

"তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে। শাঁখা শাড়ি সিন্দুর চন্দন পান গুয়া। নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া।" বৈষ্ণব সাহিত্যেও রাধার মধ্য দিয়ে বাঙালি মেয়েদের বেশভূষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কবি চন্ডীদাসের গ্রাম বাংলার রাধা বিরহে 'রাঙ্গাবাস' পরে। আবার চৈতন্যোত্তর গোবিন্দদাসের রাধা অভিসার যাত্রা করে নীল শাড়ি পরে। তাই কবি বলেন—

" বারি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।।"

পৃথক পৃথক রুচির শাসক শ্রেণি এদেশে আগমনের ফলে বাঙালির অভিজাত পরিবার গুলিতে কিছু প্রভাব পড়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে হেরে আমরা আমাদের রুচিবোধ হারাতে শুরু করেছিলাম। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির মননে 'আধুনিকতার' ইঞ্জেকশন ঢুকিয়ে দিয়েছে শাসক ইউরোপীয় গোষ্ঠী সমূহ। যা বাঙালির জিন ঘটিত হয়ে গেছে। তবুও কিছু বাঙালির দেখা মেলে যারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাঙালির ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে।

অষ্টাদশ শতকের 'বাবুকালচার' এবং ইংরেজী জানা হেনরি ডিরোজিওর অনুগামীদের মধ্যে শুধু নয় এ প্রভাব পড়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘর ও বাহির' রচনার কিছু অংশ তাঁরই প্রমাণ দেয়— 'আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত খলিফা অবহেলা করিয়া আমাদের জামাই পকেট যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখবোধ করিতাম'।

১৯১৩ সালে চলচ্চিত্র জগতের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে ইউরোপীয় পোশাক আরো জাঁকিয়ে বসে বাঙালির দেহে। সত্তর-আশির দশকের সিনেমা প্রেমিক বাঙালিরা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছে উত্তম-সুচিত্রা, অমিতাভ-জয়ার অনবদ্য পোশাকের ধরণ, চুলের কাটিং এবং নানা অলংকারের গহনা।

বিংশ শতকের শেষার্ধে পুরুষের অফিসের একমাত্র পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি। কিন্তু আজ একবিংশ শতকের ইউরোপীয় পোশাকের দাপটে বিয়ের আসর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারে না ধুতি-পাঞ্জাবির। তবে দুগ্‌গা মায়ের আশির্বাদে দক্ষিণাকাশের মেঘের মতো ক্ষনিকস্থায়ী হয় অষ্টমীতে। কেননা শার্ট, প্যান্ট, কোর্ট, ব্লেজার, টি-শার্ট, জিন্সের ঝোড়ো হাওয়ায় দক্ষিণাকাশের ধুতি-পাঞ্জাবি উড়ে যেতে বাধ্য হয়। নারীরা-মায়েরা শাড়ির ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখলেও বর্তমান সময়ে ল্যাহেঙ্গা, চুড়িদার, প্যালাজো ধরনের পোশাক, তুলনায় সহজে পরিধেয় বলে শাড়ি আজ আলমারিতে মিউজিয়ামের মত করে সাজানো থাকে। তবুও আজও গ্রামবাংলার মায়েরা সযত্নে আগলে বুকে। বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে মায়ের আঁচলেই মুখ মোছে।

অলংকার বলতে সোনা-রুপার পাশাপাশি হিরে, প্লাটিনামের তৈরি গহনাও বাঙালি আজ সাবলীলভাবে ব্যবহার করছে। প্রাচীনকালের মতন নারীদের নানা অলংকারের ধারণা আজও এক থাকলেও নকশাগুলি শুধু পাল্টেছে তা নয় বদলে গেছে গয়না তৈরির উপাদানও। পুরুষেরা সাধারণ দু-চারটে আংটি আর গলায় একটি মালা এবং হাতের ব্রেসলেট জাতীয় বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

তাই পরিশেষে এই দুঃখের সাথে, ক্ষোভের সাথে বলতে হয়—আমরা বাঙালিরা নিজেদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে গলাটিপে হত্যা করে কবরের তলায় ক্যাফিন বন্দি করে নিশ্চিহ্ন করার প্রতিযোগিতা শুরু করেছি। আমার বিশ্বাস গ্রামবাংলার মানুষেরা আমাদের ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হবে।

অন্তরে অন্তরে

সামিম মন্ডল
রোল নং- ৪, তৃতীয় বর্ষ (সাধারণ)

সকাল নয়টা বাজে... বড় রাস্তার মোড় থেকে এগিয়ে আসছে সাদা রঙের গাড়ি। গাড়িটা এসে থামল চ্যাটার্জি বাড়ির সামনে, কে এসেছে? আজ বারো বছর পর বাড়ি ফিরেছে এই চ্যাটার্জি বাড়ির বড় আদরের ছেলে উজান চ্যাটার্জি। আজ সপ্তমী চারিদিকে ঢাক এর আওয়াজ পূজা শুরু হয়ে গেছে গতকাল থেকেই, তবে উজান বাড়ি ফিরে আসতেই যেন চ্যাটার্জি বাড়ি ঝলমল করে উঠল। উজান বাড়ি ঢুকতেই রঘুদা বলে উঠল বড় গিন্নিমা... ছোটো দাদাবাবু বাড়ি ফিরে এসেছেন। মা আশালতার চোখ জুড়ে জল এতদিন পর সে ছেলেকে দেখবে। তার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি শুরু হল একজন মা এতদিন সে তার সন্তান কে দেখবে। উজান যখন মা বলে ডেকে উঠল তখন আশালতার এক মুহূর্তের জন্য মনে হল সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। তার মনে হল বুকের উপর থেকে যেন ভারী কিছু চলে গেল। সে ছেলের দিকে তাকিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ছেলের কপালে স্নেহের চুম্বন এঁকে দিলেন।

উজান তার ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে পূজা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলো, এতদিন পর তার সব বন্ধুদের সাথে দেখা হল। তার মনের মধ্যে অনেক আনন্দ উল্লাস জেগে উঠল। তাদের একসাথে খেলার জায়গা গুলি দেখে বন্ধুদের সাথে হাসি ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে স্মৃতিচারণ করতে লাগল। আজ অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে এসেছে উজান এর চোখ পড়ল একটি মেয়ের দিকে। এক মুহূর্তের জন্য উজান যেন কেমন থমকে গেল মেয়েটির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে, উজান যেন কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেলো। এতদিন বিদেশে থেকেই এ রকম সুন্দরী মেয়ে সে তার জীবনে আগে কখনও দেখেনি। তার সারা মন জুড়ে শিহরণ জেগে উঠলো। হঠাৎ পাশ থেকে একজন ডেকে উঠল নয়ন...হ্যাঁ আসছি বলে মেয়েটি চলে গেলো। উজানের বয়স মাত্র ১৯ বছর হল, রাতে খাবার পর সবাই যখন ঘুমঘোরে মগ্ন হয়ে আছে মধ্যরাতে সারা বাড়িময় নিস্তব্ধ উজান এর দু'চোখে ঘুম নেই, তার নয়ন জুড়ে শুধু নয়নের সেই সুন্দর অপরূপ মুখটি বারবার ভেসে আসছিল দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নীল রঙের শাড়ি, এলোমেলো, কালো রঙের ব্লাইজ, হালকা লিপস্টিক আর কপালে ছোট্ট একটা টিপ পরা নয়ন।

আজ নবমী। উজান পরেছে সাদা রঙের একটি পাঞ্জাবি। উজান মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল নয়ন যেখানে আগে থেকেই উপস্থিত সে সকলকে খাবার পরিবেশন করছে হঠাৎ নয়নের চোখ পড়লে উজানের দিকে, সে দেখল এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। নয়ন মুচকি হেসে চোখ সরিয়ে নিল। উজান একটি জগ ও গ্লাস নিয়ে সকলকে জল দিতে লাগল। কিন্তু নয়নের নয়নগুলো শুধু বারবার ঘুরে ঘুরে উজানের দিকে দেখে উজানের গালে টোল খাওয়া হাসি দেখে তাকিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর নয়ন উজানের দিকে এগিয়ে আসলো শুনছেন একটু জল হবে। উজান চুপচাপ সে শুধু নয়নের দিকে তাকিয়ে আছে। নয়ন এই যে শুনছেন একটু জল হবে হ্যাঁ অবশ্যই, Hi আমি নয়ন, নয়নতারা সেন। Hey আমি উজান চ্যাটার্জি তা আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি এ পাড়ায়। নয়ন বলল, আমরা এ পাড়াতে এসেছি এই পাঁচ বছর হল। ওহ, আমিও পড়াশোনার কারণে শহরে ছিলাম তাই আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি।

বাড়ি ফিরে উজান শুধু সারাদিন নয়নের কথা ভাবতে থাকে নয়নের মুখ ঘুরে ফিরে তার সামনে আসে উজান তার ছোট কাকার মেয়ে তার ছোট বোন চিনিকে ডেকে বলল চিনি তুই নয়ন বলে কাউকে চিনিস? নয়ন দিদি, হ্যাঁ চিনিতো। নয়ন দিদির খুব ভালো গানের গলা। হুম... খুব মিষ্টিও। কি বললে দাদা? না, কিছুনা। তুই নয়নের ঠিকানা দিতে পারবি। হ্যাঁ, নয়ন দি তো আমাদের বাড়ির থেকে বেরিয়ে সোজা পাঁচ মিনিট হেঁটে বাঁ দিকে গিয়ে কিছুটা দূর পর যে সাদা রঙের বাড়ি আছে না একটা দোতলা তারপাশের একতলা বাড়িটা নয়ন দিদিদের কিন্তু...।

কিন্তু কি... কাল মা বিসর্জন এর সাথে সাথে নয়নদিরাও পাড়া ছেড়ে চলে যাবে, একথা শুনে উজান এর সারামন যেন গোলাপের কাঁটার আঘাত এ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। জীবনে কোন মেয়েকে তার এত ভালো লেগেছে। তবু সে মনে অনেক আশা নিয়ে পরদিন সকালে চিনি কে নিয়ে নয়নদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিন্তু সেখানে এসে দেখল দরজায় একটি তালা ঝুলছে।

কনট্রাস্ট

শশাঙ্ক শুভ্র সরকার
বিএ, ইংরেজি (সাম্মানিক), ৩য় বর্ষ

[এক]

বর্ষাকালের নাগপাশে এই জলের বিন্দুগুলি ক্লান্তিকে উপেক্ষা করেই অবিরামভাবে সুমধুর শব্দে মেঘ থেকে ঝরে পড়ছে। অনিশার অনুরোধে সুদর্শনকে ছাদে উঠতে হল। বৃষ্টির ঝাপটা যেন বেড়েই চলেছে। প্রকৃতি যেন বর্ষাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে বলছে, 'ভিজিয়ে দাও এই ধরণীতল, শান্ত কর চারিদিকের উষ্ণতাকে। অনিশা যেন ত্বকের পিপাসা মেটাতে চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে উন্মুক্ত করে বৃষ্টিতে সিক্ত হতে চাইছে। অনেকটা সিনেমার কাপেলদের মতো দুজন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করতে চাইছে। একটা রোমান্টিক পরিবেশ!

[দুই]

টালির চালের অনাবৃত অংশ দিয়ে জল ক্রমাগত নিচে চুঁইয়ে পড়ছে। মাটির মেঝে কর্দমাক্ত, গুটিসুটি মেরে উঁইয়ের কামড়ে জর্জরিত খাটের ওপর বসে আছে এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। একটা ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে, 'আমাদের সুদো বৃষ্টিতে সামান্য ভিজলেই জ্বরের কবলে পড়ত'। প্রকৃতির রোষানলে হঠাৎই একটা টালি ভেঙে তাদের সামনে পড়ল। বাইরের ঘনঘন বজ্রপাত সাথে বৃষ্টির ছন্দমধুর শব্দের মধ্যেও দুজনের নীরবতা যেন গভীর থেকে গভীরতর। জীবনের এই অন্তিম পর্যায়ে তাদের মনে পড়ছে বহুপূর্বে ছেলে সুদর্শন এর সাথে ফোনে কথাবার্তার কিছু মুহূর্ত। বয়সের ভারে স্মৃতিশক্তি ক্রমশ হ্রাসমান তবুও সেগুলো রোমন্থন করে যেন নিজেদের অসহায়তা ও তাদের ছেলের বিলাসবহুল ও তাদের ছেলের বিলাসবহুলতার পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করছে দুজন।

গ্রীষ্মকালের ফোনে কথোপকথন

'মা, শহরের যা অসহ্য গরম! আমরা সবাই মিলে তাই লাদাক যাচ্ছি। তোমার বৌমার আবার গরমে ত্বকের নানা সমস্যার সূত্রপাত হয়। তাই ওখান থেকে এসেই একটা এসি কিনবো। ওদিকে গরম কেমন? গ্রামে তো প্রকৃতির হওয়ার মজাই অন্যরকম'। দুজনের নির্লিপ্ত চাহনি যেন বলতে চায়, ইলেকট্রিক বিলের টাকা জমা দেওয়া হয়নি বলে বাড়িতে লাইন কেটে দিয়ে গেছে। এমনকি ঘরের পাখা বিক্রি করতে হয়েছে ওষুধ কেনার জন্য।

বর্ষার সময়

'বাবা, তোমার বৌমার এদিকে কোলকাতার এই স্যাতস্যাতে ওয়েদার আর ভাল লাগছে না। এদিকে তোমার নাতিও শুষ্ক কোথাও ভ্রমণের বায়না করছে। তাই আজ রাজস্থান ট্যুরের প্যাকেজ বুক করে এসেছি। অফিসে কাজের চাপের মধ্যেও ছুটিটা বসকে বলে ম্যানেজ করে নিয়েছি। বাড়ি আসার সময় নেই। তুমি তো এবার পান চাষ করেছিলে। ওতে তো ভালো লাভ হয়। ভাবছি, সামনের বছর নর্থ কোলকাতার দিকে একটা ফ্ল্যাট নেবো। তোমার বৌমার এই জায়গা এখন একঘেয়ে লাগছে। আর হ্যাঁ, বাড়ির চালটা মেরামত করে নিয়ো'। দুজনের অসহায় দৃষ্টি যেন নিরবে বলতে চায়, অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে গেছে

এমনকি মহাজনের টাকাও শোধ করা হয়নি।

দুর্গাপূজার সময়

'মা, এই পুজোয় সারা কোলকাতার পুজো পরিক্রমা করবো আর প্রচুর ভিআইপি পাসও পেয়েছি। একটা এসি বাসও ভাড়া করেছি সবাই মিলে। তোমার বৌমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও আমার অফিস থেকে কয়েকজন কলিগ সস্ত্রীক থাকবে। এই সেদিন একটা শপিং মলে গিয়ে সবার জন্য মার্কেটিং করে এলাম। তোমার বৌমাকে নেকলেস উপহার দিয়েছি। আচ্ছা চাকরি পাবার পর যে শাড়িটা দিয়েছিলাম ওটা যত্ন করে রেখেছো? গ্রামে তো পূজা হয়। বুড়োশিবতলায় বাবাকে নিয়ে ঘুরে এসো'। বৃদ্ধার পরনে এক শতছিন্ন বস্ত্র। চাকরি পাবার পর কর্তব্য পালনে দেওয়া সেই শাড়ি!

শেষ ফোন

"তোমার বৌমা আবার নাকের আকৃতি নিয়ে বিষাদগ্রস্ত। তাই ওকে সামনের বছর বিদেশে নিয়ে যাচ্ছি রাইনোপ্লাস্টি করার জন্য। বাবার বুকে ব্যথা হয় শুনলাম। ওটা হয়তো গ্যাসের সমস্যার জন্য হবে। গ্রামের কোনো ডাক্তার দেখিয়ে নিও। গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শহর থেকে ভালো ডাক্তার আসে'।

[তিন]

কনকনে ঠান্ডায় আগুনের স্পর্শে নিজেকে উষ্ণ করায় মগ্ন সুদর্শন। বাংলোর সামনে সুবৃহৎ বাগানের একপাশে দেখা যাচ্ছে আগুনের হলকা। সুদর্শনের পাশে আরো অনেকে বসে। মাঝেমধ্যে তারা হাতদুটো স্লিভ থেকে বার করে এনে আগুনের উত্তাপ নিচ্ছে। এবার সবার অনুরোধে, সুদর্শন গিটারে হাত দিতেই সৃষ্টি হলো উদ্দম সুর। মা আংটি বেঁচে একটা গিটার কিনে দিয়েছিল! মনে আছে সুদর্শনের? এবারের আগুনটার সাথে যেন মিশে আছে একটা বিষাদের সুর। চিতার আগুনে বহুবছরের পরিপূর্ণ দুই শীর্ণ শরীর মিশে যাচ্ছে ছাই ভস্মে। দিগন্ত অতিক্রম করে সেই সুর যেন বৃথা মেশার চেষ্টা করছে বাবা-মার মৃত্যু সংবাদের ব্যাপারে অজ্ঞাত সুপ্রতিষ্ঠিত যুবক সুদর্শনের গিটারের ধ্বনির সাথে।

মা

কেয়া মন্ডল
এম.এ. তৃতীয় ষন্মাস

দিনের শুরু সকাল দিয়ে
আমার শুরু তুমি,
তোমার মাঝে আমি আছি
আমার মাঝে তুমি,
তোমার মাঝে কাটিয়ে আসা
সেই নয়টি মাস,
সে যেন মোর জীবন মাঝে
সুখের স্বর্গবাস।
দিনের পরে দিন কেটেছে
আমার প্রতীক্ষাতে,
ভেবেছ কখন রাখবে ও হাত
আমার ছোট্ট দু'টি হাতে,
যখন এলাম জগৎ মাঝে
তোমার কোলের কাছে,
ধন্য হলো জন্ম আমার
ভালবাসার ছোঁয়ায় তোমার
পূর্ণ হল সাধ।
আমার প্রিয় বন্ধু তুমি
এমনি করেই থেকো
এই মানুষের ভিড়ের মাঝে
সামলে আমায় রেখো

গোধূলি

কেয়া মন্ডল
এম.এ. তৃতীয় ষন্মাস

চলে যাও চুপি চুপি আলোটাকে নিয়ে
মনের ইচ্ছে দাঁড়ায় আকাশেতে গিয়ে,
বিকেলের স্তব্ধতা মনকে টানে
নীরব সে ফুলগুলো গন্ধটা আনে।
ভেসে যাওয়া সে হাওয়ায়
সব শোক মুছে যায়,
আকাশটা ভরে যায় পাখিরই উড়ানে।
মনে হয় কথা নয় শুধু নীরবতা
মুছে ফেলো মনের ওইসব ব্যাকুলতা।

বৈপরীত্য

চয়ন সরকার
বিএ, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ (সম্মানিক)
সেমিষ্টার-৪

‘সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই’
এই কথাটি ভুলে গেলে চলবে না তো তাই
মানুষ আজ মঙ্গলে গেছে, তবু তাহার মঙ্গল যায় নাই,
তাই তো আজ দেখা যায় দু-মুঠো খাবার জন্য মানুষ করছে হায় হায়
মানুষের সীমানা অসীম তবু, অবুঝের মত পাঁচিল দেয়
রক্তের পার্থক্য না থাকলেও, রক্ত নেওয়ার খেলায় মেতেছে সবাই।
ছোট ছোট যন্ত্রে, মানুষ মেতেছে, নতুন এক মন্ত্রে
জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দেশ আর কোন বিদেশ।
তবে কেন দেখা যায় নিজের মানুষই পর হয়
একই সাথে চলছি আমরা তবু মনের পার্থক্যে বহু দূরে যাই।
মানুষ আর চাঁদে, যেন মামা বাড়ির ছাদে
তবুও মানুষ একে অপরকে ফেলেছে নানা ফাঁদে
যে মানুষটি জন্মাবার পর অসহায়ের মতো কাঁদে
সেই মানুষটি মারা গেলে বাকিরা তাকে ঘিরেই কাঁদে
মানুষ আজ শক্তিশালী, কি না আছে তার।
এই মানুষকে দেখা যায় দুঃখে আছে আবার।
যোগাযোগ আজ তার হাতের মুঠোয়, মানুষের বিজ্ঞান সহায়।
এই মানুষই বন্দুক হাতে আমাদেরই ডরায়
একদিন যে মানুষটি পশুদের খাদ্য হত
সেই মানুষই পশুর মতো ভাইকে করছে আহত।
মানুষের আজ ডানা গজায় নি তবুও সে ওড়ে
ওড়ার মত পাখিরা সব গাছের অভাবে মরে
মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ প্রাণী তাইতো সবাই জানে
নিজেকে সেটা প্রশ্ন কর তুমি কি সেটা মান?
মানুষ কি শুধু মান আর হুশ আর কি কিছু নাই
মানবিকতা চলে গেলে তাকে কি বলবে ভাই।
মানুষকে আজ বুঝতে হবে সে রাজি অজয়।
কিন্তু সবাই যদি মরে যায় সে থাকবে কোথায়?
ওই মানুষ ভেবে দেখ কেন মানুষ বলি তোমায়।
মানুষ হয়েও যদি মানুষই না হও এ তোমার পরাজয়!

অরুণ উদয়

চয়ন সরকার
বিএ, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ (সম্মানিক)
সেমিষ্টার-৪

অরুণ উদয় হইবে, হইবে ঈশ্বর সহায়
আবার মানুষ জাগিবে, হইবে জগত সুখময়
আবার আসবে শান্তি, দূর হইবে ক্লান্তি,
এই বিশ্বাসটি রাখিয়া যাও, ভাগ্য হইবে সহায়,
আবার পরিষ্কার হইবে পরিবেশ মনের ময়লা ধুইবে তায়
মানুষ আবার শান্ত হইবে সত্যই যে সুন্দর
অন্ধকার দূরে যাইবে তায়,
আমরা ভালো হইলে জগত ভালো হইবে
ছোট একটা পদক্ষেপ নাও সেটাই বড় হইবে।
অন্ধকার যখন ঘনিয়ে আসে আলোর রেখা দেখা যায়
সত্যের বাতি জ্বালিয়ে ধরলে আলোর দিন আসবে তায়।
শান্তি শুধু শান্তি এটাই কাম্য আমাদের ভাই
মানুষ যে হয়েছে, এইবার তার দাও পরিচয়।

গর্জে ওঠো

রিয়াঙ্কা সরকার
বাংলা (সাম্মানিক), ৩য় সেমিষ্টার

মোমবাতি তো জ্বলল অনেক,
এবার না হয় গর্জে ওঠো,
তোমায় বাঁচাতে আসবে না কেউ,
নিজের জন্য নিজেই ছোটো,
তুমি পুড়লেও জ্বলবে মোম,
কদিন দেবে পত্রিকাতে।
এবার না হয় গর্জে ওঠো।
জন্তুগুলোর শাস্তি দিতে।
নারী তুমি লড়তে শেখো,
দুই হাতে নাও অস্ত্র তুলে।
তুমি পুড়লেও সবার মতো,
যাবে তোমায় সবাই ভুলে
তাই নারী গর্জে ওঠো,
জন্তুগুলোর শাস্তি দিতে,
তুমি পুড়লেও জ্বলবে আলো,
কদিন দেবে পত্রিকাতে।

প্রেম-অভিসারিকা

দিশা হালদার
সাম্মানিক স্নাতক, বাংলা বিভাগ

মধুময় প্রকৃতি।
মাথার ওপর শুক্লপক্ষের চাঁদ।
আকাশ ও প্রকৃতি খুশি থাকলেও
আজও আমি একাকীই...
আমি রাধিকা, প্রেম-অভিসারিকা...

অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিয়েছি যত অভিমান,
গন্তব্য, তোমারই আশ্রয়...
ঝড়-বাদল-মেঘের চোখরাঙানিকে ভুলতে পারি
চলতে পারি দুর্গমঅভিসারেও
শুধু তোমারই চোখের লক্ষ্যে, তোমারই মনের পক্ষে...

তবুও কি মহিমা তোমার!!!
কাঁদালে আমায়, দিলে না সান্ত্বনা...

তবুও আমি তোমারই প্রতীক্ষায়...
কেননা, রাধিকা তো প্রেমেরই কাঙাল...
আমার আকাশ শীতল এখন...
আসন্ন সন্ধ্যারাগ মাঝেমাঝেই ভাবায় আমায়, কাঁদায় না আর...
কেননা, চোখের জল শুকিয়ে জীবন মিশছে
সন্ধ্যার আকাশের সাথেই
সামনেই অনন্ত রাত...
তবুও তোমার প্রতীক্ষাতেই
হারিয়ে যাবো তবুও আমি, হারিয়ে যাওয়া তোমার সাথেই...

বাঁচার ইচ্ছা

সুস্মিতা সরকার
এম.এ, প্রথম ষন্মাস (২০১৯-২০২০)

মনে হয় যদি পাখি হতাম
তাহলে আকাশে উড়ে যেতাম
মুক্তমনে উড়ে উড়ে নেচে বেড়াতাম
গিয়ে বসতাম গাছের ডালে
ঘুরে ঘুরে বসতাম কচি ঘাসের উপর
থাকতো না কোন বাধা বন্ধন জটিল জীবন
দুঃখ যন্ত্রণা বা লোভ লালসা
মনের আনন্দে উড়ে গিয়ে গাছের ফল খেতাম
আর আনন্দে ভাসতাম দেশে দেশে
কিন্তু না এই জটিল জীবনেই আমি থাকতে চাই
মাথা উঁচু করে জীবনের জটিল সমস্যাগুলি পেরিয়ে
তাই চাই বিশ্বাস, সততা, ভালোবাসা, মানবতা, ভালো হওয়ার ইচ্ছা।

ক্ষুধিতের দাবি

সুস্মিতা সরকার
এম.এ, প্রথম যন্মাস (২০১৯-২০২০)

খাদ্যভান্ডার রুদ্ধদ্বার
দ্বার খুলে দাও মজুতদার
বুভুক্ষার দাবানলে
প্রজ্জ্বলিত অবিকলে
খাদ্যভান্ডার রুদ্ধদ্বার
দার খুলে দাও মজুতদার।

জীবন

পায়েল মণ্ডল
সান্মানিক (বাংলা), তৃতীয় যন্মাস

এ জীবন কখনও সাতরঙে রাঙা
আলো ঝমকানো ঝাড়বাতি,
এ জীবন আবার কখনও অন্ধকারে ভরা
দুঃখ-কষ্টে আচ্ছন্ন,
চোখের জলের অতল সমুদ্র,
জীবনের নানান মুহূর্ত ঘিরে
আছে সুখ-দুঃখ হার জিতের খেলা,
আমৃত্যু জীবনকে এগিয়ে যেতে হয় ধাপে ধাপে
এই এগিয়ে যাওয়ার ধাপে,
আসবে চড়াই আসবে উৎরাই
আসবে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা।
দুঃখ-কষ্ট আষ্টেপৃষ্ঠে
জড়িয়ে ধরবে হঠাৎ মোদের।
সেইজন্য মোরা স্তিমিত হয়ে যাব না।
জীবন কখনও থেমে থাকে না
শুধু বদলায় পরিস্থিতি,
পরিস্থিতির তালে তাল মিলিয়ে চলতে হয় মোদের।
দুঃখ-কষ্ট, ব্যর্থ তাই যেন প্রতিনিয়ত,
শিখিয়ে দিতে থাকে জীবনের খাঁটি মানে
জীবনে একটাই ধর্ম সত্যধর্ম
সত্য ধর্মের পথের পথিকই পারে
জীবনের আসল সত্যকে খুঁজতে,
জীবন মানেই তো আসবে কষ্ট আসবে সুখ
কিছু নেবে ছিনিয়ে কিছু দেবে মুট ভরে,
সবকিছুর মাঝে নিজেকে প্রতিনিয়ত
নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করার
নামই তো জীবন।।

বর্তমান সমাজ

দীপা ঘোষ
এম.এ, বাংলা বিভাগ (১ম সেমিষ্টার)

দিন পাল্টে গেছে
পাল্টেছে সমাজের নকশা
পরিবর্তন ঘটেনি মানুষের—
পরিবর্তন ঘটেছে মনুষত্ব্যের,
বিবেকের রঙ তাই আজ কালো...
সরলতার স্থান হটিয়ে—
জাঁকিয়ে বসেছে কূটনৈতিকতা।

সময় বদলে গেছে—
মানবতার বড্ড অভাব আজ
বেড়েছে হৃদয়ের জটিলতা,
সুখের পায়রা এখন আর
বাসা বাঁধে না ঘরে
শান্তির বড় অভাব—

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে
হৃদয়েরও ঘটছে বদল,
কারো চোখে মুখে এখন আর
সরলতার ছাপ দেখা যায় না,
পাল্টে গেছে চিন্তারও আদল।
সভ্যেরা হারিয়েছে আজ—
সৌভ্রাতৃত্ববোধের একতা,

রাজনীতির রং বেরং এর মেঘ—
বদলে দিয়েছে সমাজের নকশা;
সমাজের নকশা বদলের সঙ্গে সঙ্গে—
বদল ঘটেছে শুভবুদ্ধিরও নকশা,
জন্মভূমি আজ তাই—
হিংসার রক্তে লাল...।
তবুও,
দিন পাল্টালেও—
সময় বদলালেও—
হৃদয়ের আকৃতির এখনো ঘটেনি বদল,
আমাদের রক্ত এখনো লাল,
এখনো প্রিয়জনের দুঃখে আকুল করে মন,
তবে—
বোধহয়, আমরা চাইলে এখনো পারি—
সেই দিনটাকে ফিরিয়ে আনতে,
যেখানে—
একে অন্যের কল্যাণ কামনায়
প্রতিষ্ঠা করবে মঙ্গলঘট,
সেই নতুন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায় আজ...।

সময়

টুবাই মন্ডল
বিএ, ইংরেজি (সাম্মানিক)

ঢেউ এর পর ঢেউ আসে যায়, সময় কাটে অবহেলায়;
দিনের শেষে পাড়ে ভিড়ে, নোঙ্গর বাঁধে বালুকাবেলায়।
কত কত ক্ষণ দোলেছো পায়ে, অতীত স্মৃতি মাথায় নিয়ে;
শ্যাওলা পেরেছে দিতে কি বাধা, নদীর স্রোতকে থমকে গিয়ে?
কেউ বা আসে স্বামীর ঘরে, স্বপ্ন জোয়ার বুকেতে নিয়ে;
জোয়ারে কারো ভাসলো ভেলা, লখীন্দরের কুষ্ঠী নিয়ে।
সময় তাদের একই ছিল, কেউ গেল আজ স্বামীর ঘরে;
কেউ বা আবার ফেরাতে প্রাণ, চলল ভেসে স্বর্গদ্বারে।
যে মেয়েটা শরীর বেচে, জোটলো ভাত ক্ষিদের জ্বালায়;
শান্ত্বনা কি দিচ্ছে তারে, রুপোর চাঁদি-ফুলের মালায়!
সেদিন যদি দিতে তাকে, একটু সিঁদুর-ভালোবাসা!
বুকের কাপড় খুলতোনা সে, তোমার সাথেই বাঁধতো বাসা।
আজ কেন তবে হঠাৎ করে, দয়া দেখাও গায়ে পড়ে?
সে সময় যে নেইকো আর, সে যে এখন অন্ধকারে।
আজ কি তাকে দিচ্ছ দাম, নিজের বিবেক দংশন?
করুণা যে আজ বিষাক্ত হয়ে, দংশালো তার যৌবনে।
সময়ে মাকে দিলে না খেতে, পুড়েছে যখন অনাহারে;
আজো চিতা জ্বলছে যে তার, শায়িত দেহ কাঠের ভিড়ে।
চন্দনের ওই ধোঁয়ায় বুঝি, ভাবছো তোমার পুণ্যি হবে?
শত ব্রহ্মের আশীষ নিয়েও, ফেরাতে তাকে পারবে ভবে?
তার স্মৃতিতে দিতে পারো, প্রায়শ্চিত্তের সফেদ চাঁদর;
শত অর্থ, প্রলাপ করেও, পাবে কি ফিরে মায়ের আদর?
যখন শত সাহেব ভীড়ে, পাবেনা খুঁজে আপন শিকড়;
তখন বাঙালি বলো তুমি, বাংলা ভাষা বুকের পাঁজর।
তখন যেও জাদুঘরে, বাংলা মাকে খুঁজতে তুমি;
দেখবে সাদা কফিনে ঢাকা, শায়িতো যেন প্রাচীন মমি।
হয়তো তখন অবশেষে বলবে আপন দীর্ঘশ্বাসে;
সময় যদি একটু পেতাম বুকের মাঝে যতনে তাকে এমনি করে রেখে দিতাম।
সময় তখন বলবে হেঁসে, এসেছিলাম তোমারও দ্বারে;
সাহেব সাজতে গা উজোড়, নকল সোনায় মুড়লে মোরে।
কিন্তু এই স্মৃতিচারণ, করতে গেলেও ভীষণ দায়;
হয়তো কখন ফাঁকি দিয়ে, এই সময়ও অতীত হয়।
সবশেষে তাই, এই বলে যাই;
এই মুহূর্তের হিসাব করো, এই মুহূর্তের সময়কালে;
বিজয় তিলক হবে আঁকা, পরমুহূর্তেই তোমার ভালে।

আর একটু সময় পেলে, জীবনটাকে গুছিয়ে নিতাম;
কথাগুলো জোলো ভীষণ, বাস্তবে এর নেই যে দাম।
এই দ্যাখোতো খেয়াল বসে, কতটা সময় নষ্ট হল;
সময়ের দাম বোঝাতে গিয়ে, কবিতা লেখায় সার হল।

উপলব্ধি

অভি চক্রবর্তী
বিএ, ইংরেজী (সাম্মানিক)

'এই নে আমার বিয়ের কার্ড, আসবি কিন্তু'। নির্দ্বিধায় অবলীলায় কথাগুলো বলে ফেললো নীলা, প্রতি উত্তরে কিছুই বলতে পারলনা সপ্তক। কোনরকমে একটু হেসে ব্যাথাতুর হৃদয় নিয়ে বিদায় নিল সে, বিদায় নিলে হয়তো ভুল বলা হয়, সপ্তক আসলে অবশ্যম্ভাবী আগত এই ধাক্কার থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পালাতে চেষ্টা করল। বাড়িতে সে আসলো অনেকটা টলতে-টলতে, মনে হয় ওর অসুখে ধরছে, আর এ যে-সে অসুখ নয়— মনের অসুখ। কোনকিছুই যেন তার ভাল লাগছিল না, বুকের মধ্যে এক আচমকা ব্যথা হতে শুরু করল, আর তার সাথে কী যেন একটা অসহায়তা আর অমানবিক একাকীত্বের যন্ত্রণা সমগ্র হৃদয়কে গ্রাস করতে শুরু করেছে। সে তার বাড়ির প্রশস্ত জানালা দিয়ে দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে প্রচুর লোক তাদের নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়েছে, তাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে, চারিদিক ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ, বিচিত্র পাখির কোলাহল ও কলকাকলিতে প্রকৃতি যেন নিজ শোভা চারিপাশে বিকিরণ করছে— কিন্তু এত সুন্দর শোভা সপ্তকের কাছে ম্লান লাগতে লাগল। দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার সবসময়ের সঙ্গী গিটারটাকেই কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল একটু লোকালয়ের থেকে দূরে তার পছন্দের একটি পোড়োবাড়ি সংলগ্ন স্থানে যাওয়ার জন্য। যেতে যেতে মনে পড়ছে নীলার সাথে কাটানো সব স্মৃতি, ছোটোখাটো সময়গুলো, যেগুলো সে কিছুতেই ভুলতে পারছেনা।

সে দিনটা ছিল কলেজের নতুন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের ষষ্ঠতম দিন, সপ্তক এইদিনেই প্রথম দেখে নীলাকে— তার পরনে ছিল হলুদ রঙের সালোয়ার-কামিজ। সপ্তক প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে যায় নীলার, তখনও সে নীলার নাম জানতো না, পরে আস্তে আস্তে নীলার সাথে তার বন্ধুত্ব খুব সুন্দর হতে শুরু করে ও সপ্তক আরও ভালোবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পরে, কিন্তু নীলার সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে কিছু বলতে পারেনা।

এরকম ভাবে চলতে থাকে দিনের পর দিন, ক্রমে ফাস্ট ইয়ার পাস করে দুজনেই সেকেন্ড ইয়ারে ওঠে। এর মধ্যে সপ্তক উপলব্ধি করতে পারে যে, নীলা হয়তো তার মনের ভাব কিছু হলেও বুঝতে পেরেছে। মেয়েদের এই অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা সপ্তককে সবসময়ই ভাবিয়েছে যে কী করে তারা বুঝে যায় যে, কে তাদেরকে ভালোবাসে গোপনে! সপ্তক একদিন ঠিক করেই নেয় যে আজ যা হয় হবে, কিন্তু মনে এক আর মুখে এক নিয়ে আর কিছুতেই চলা যায় না— এই পরিস্থিতি যেন ক্রমেই অসহ্যকর হয়ে উঠছে সপ্তকের কাছে। একদিন সাহস করে কলেজে এগিয়ে গেল নীলার কাছে—

'নীলা, একটু শোন, আলাদা করে কিছু কথা আছে তোর সাথে'— বলল সপ্তক,

নীলা যে সত্যকে অপছন্দ করতো এরকম কোনো ব্যাপারই ছিল না, আসলে নীলাকে যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজে সাহায্য করত সপ্তক, যেন তার ছায়াসঙ্গী সে, বেস্ট ফ্রেন্ড বললেও ভুল বলা হয়। নীলা সবকথাই প্রায় শুনতো সপ্তকের, কিন্তু সপ্তকের এরকম ক্লাসরুমের বাইরে আলাদা করে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী কথা থাকতে পারে, তা ভেবেই একটু অবাক হল সে।

'বল, কী বলবি?'— বলল নীলা,

'উহু! এখানে নয়, আমার সাথে বাইরে চল, বলছি' — বললো সপ্তক।

কলেজের গার্ডেনটাতে নিয়ে গিয়ে খুব সাহস করে বলে ফেললো সপ্তক তার মনের সব কথা, তা শুনে নীলা অবাকের থেকেও বেশি লজ্জা পেলো বলাই ভালো- যেন মনে হচ্ছে সে এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল।

'আমি তোকে ভালোবাসি, কিন্তু তুই যেভাবে চাইছিস সেভাবে হয়তো তোকে ভালোবাসা সম্ভব হবে না'— কিছুটা লজ্জা ও বোধ করি কিছুটা ভয়ভরা গলাতে রুদ্ধশ্বাসে বলে ফেলল নীলা, সে তখন কিছুটা অধোবদনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাস্তবিকই, এরকম উত্তরের আশা কখনই করেনি সপ্তক, প্রচণ্ড মানসিক ভাবে আহত হল সে।

"কেন, আমি কি তোর যোগ্য নই নীলা? নাকি আমাকে

দেখতে খারাপ বলে তুই একসেপ্ট করতে পারছিস না? নাকি তোর পরিবারে কোন প্রবলেম আছে? বল নীলা চুপ করে থাকিস না, আমি তোকে সত্যিই খুব ভালোবাসি— এমন নয় যে, আমি একদিন তোর সাথে মিশেই তোর প্রেমে পড়ে গেছি, না না তা একদমই নয় রে, অনেকদিন ধরে ভেবে চিন্তে, এমনকি নিজের মনকে অনেকবার প্রশ্ন করে যখন একই উত্তর বার বার পেয়েছি, তখনই আজ তোকে সাহস করে বলতে এসেছি'।

নীলা এরকম আবেগভরা উত্তরে খুব বেশি প্রভাবিত হল বলে মনে হয় না।

'এই ব্যাপারে বলে প্লিজ আমাকে আর বিরক্ত করিস না আমাদের এত সুন্দর বন্ধুত্বটা আর থাকবে না রিলেশনশিপে গেলে, চল, ক্লাসে দেরি হয়ে যাচ্ছে।' বলে হনহন করে হাঁটা দিল নীলা, সপ্তক ধপ করে বসে পড়ল গার্ডেনে থাকা বসার জায়গাতে।

থার্ড ইয়ারের প্রায় শেষের দিক। সপ্তক ওই নিয়ে নীলাকে আর কিছু বলেনা প্রায় ৯ মাস ১৭ দিন হতে চললো, সে আসলে এই ক'দিনে শিখে গেছে যে কি করে ভালবাসার সমস্ত আবেগকে চেপে রেখে বন্ধু হিসেবে তার ভালোবাসার মানুষের পাশে থাকা যায়। নিঃস্বার্থভাবে সবকিছুতেই সাহায্য করে, নীলাও তার যাবতীয় সুখ-দুঃখের কথা তার কাছে বলে, তারা তাদের দু'জনের বার্থডেটাও খুব সুন্দর ভাবে পালন করেছে, সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছে ফেসবুকে উইশ করতে গিয়েও, কিন্তু সপ্তক জানতো, এসবই বন্ধুত্বের ভালোবাসা। সপ্তক নিজেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিত, আবার নিজেই নিজের অবস্থাতে অবাক হয়ে গিয়ে কেঁদে দিত। সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল নীলাকে ভুলে যাওয়ার জন্য, আস্তে আস্তে ভুলে যেতে চাইছিল সবকিছু, কিন্তু পারেনি সে।

থার্ড ইয়ার শেষ হয়ে গিয়ে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হয়ে গেছে প্রায় ৪ বছর হল দু'জনের। নীলা ও সপ্তক দু'জনেই তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ও সুপ্রতিষ্ঠিত, নীলা একটি বড় কোম্পানিতে জব করে আর সপ্তক ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে। সময়ের অভাবে আর আগের মতন কথা হয়না দু'জনের। সপ্তক ইতিমধ্যে শুনেছে নীলা একজন ছেলেকে ভালোবাসে আর ওর বাড়ির থেকে মেনেও নিয়েছে, বিয়েটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, সবই জানে সপ্তক আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এসবই তাকে বলেছে নীলা। অবশেষে একদিন নীলা দেখা করলো সপ্তকের সাথে দীর্ঘ ৪ বছর ৫ মাস পরে, হাতে তার বিয়ের কার্ড, সপ্তককে নিমন্ত্রণ করতে এসেছে সে। আজও কী অসাধারণ লাগছে নীলাকে দেখতে, চুলটা কপালের উপর লুটিয়ে পড়ে তার শোভা যেন আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে— সপ্তক আবারও যেন তার এই সুন্দর রূপের মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিন্ত হোশ ফিরল নীলার প্রাণোচ্ছল কণ্ঠস্বরে—

'এই নে আমার বিয়ের কার্ড, আসবি কিন্তু'।

নির্দ্বিধায় অবলীলায় কথাগুলো বলে ফেললো নীলা, প্রতি উত্তরে কিছুই বলতে পারলনা সপ্তক। কোনরকমে একটু হেসে ব্যাথাতুর হৃদয় নিয়ে বিদায় নিল সে, বিদায় নিল বললে হয়তো ভুল বলা হয়, সপ্তক আসলে অবশ্যম্ভাবী আগত এই ধাক্কার থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য পালাতে চেষ্টা করল। বাড়ীতে সে আসলো অনেকটা টলতে টলতে, মনে হয় ওর অসুখে ধরেছে, আর এ যে-সে অসুখ নয়— মনের অসুখ। দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য তার সবসময়ের সঙ্গী গিটারটাকে কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পরল একটু লোকালয়ের থেকে দূরে তার পছন্দের একটি পোড়োবাড়ি সংলগ্ন স্থানে যাওয়ার জন্য।

নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে সপ্তক দেখতে পেল গোধূলি বেলার পড়ন্ত রৌদ্রের রক্তিম আভা পুরো মাঠের মতন ফাঁকা জায়গাটাকে প্রচন্ড রকমের মায়াবী করে তুলেছে। একটা বুড়ো বট গাছের নিচে গিয়ে গিটারটা বের করে বসল সে। সে একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে, হয়তো নীলার কথাই ভাবছে। সপ্তক বরাবরই কাঁদতে পারেনা একদম, এখনও সে কাঁদল না, বরং কীসের একটা প্রশান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে, গিটারে অজান্তেই সে গেয়ে উঠল Linkin Park—এর গানের একটি লাইন —

"I Tried So Hard and Got So Far;
But In The End It doesn't even Matter..."

গানটা গেয়েই তার মনে হলো তাই তো কথাটা তো একদম খাঁটি কথা, সত্যিই তো দিনের শেষে এগুলোর কোনো মূল্যই নেই কারোর কাছে, এমনকি যার জন্য সে এত কষ্ট পাচ্ছে সেই নীলার কাছেও এই দুঃখের কোন কিছুই ম্যাটার করে না, তো কী হবে দুঃখ পেয়ে, এই পার্থিব জগতে জন্ম-মৃত্যুর মতই সুখ দুঃখও অতি নিত্যনৈমিত্তিক এক ঘটনা, যেন একই মুদ্রার

এপিঠ-ওপিঠ। সপ্তক উপলব্ধি করতে পারল যে, এই দুইয়ের আগমন মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যুঝতে ও সময়ের সাথে সাথে আরও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অতঃপর, মন একদম শান্ত হয়ে গেলো সপ্তকের, সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে, সপ্তকের ফোনের রিংটোন বেজে উঠলো—

"কিচ্ছু চাইনি আমি, আজীবন ভালবাসা ছাড়া—
আমিও তাদেরই দলে, বার বার মরে যায় যার"।

সম্বিত ফিরলো সপ্তকের, মা ফোন করেছে, ইশ! একদম বলে আসতে ভুলে গেছে সে। এই একজন আছে যে নিঃস্বার্থভাবে সারাজীবন তাকে ভালোবেসেছে। গিটারটা কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল সপ্তক, আর তার সাথে পিছনে ছেড়ে চললো তার সমস্ত দুঃখকে চিরতরের জন্য।

দীপাশ্রয়

তানিয়া চক্রবর্তী
বি.এড ডিপার্টমেন্ট, সেমিষ্টার-১

কলম্বিয়ান গায়িকা শাকিরার—
বিশাল একটা দ্বীপ আছে বাহামা দ্বীপপুঞ্জে।
দুবাইয়ে একটি দ্বীপের মালিক,
আমাদের প্রতিবেশী নায়ক শাহরুখ খান।
এরকম আরও অনেকের নিজস্ব দ্বীপ আছে।
অবশ্য যাদের দ্বীপ আছে, তাদের টাকাও আছে।
আমার কোনো দ্বীপ নেই, টাকাও নেই!
তবে দ্বীপবাসি হওয়ার ইচ্ছে আছে।
আবার অনেকের দ্বীপ কেনার সামর্থ্য আছে,
অথচ দ্বীপবাসি হওয়ার বাসনা নেই!
কথায় বলে—'পাগলের সুখ মনে মনে
কাগজ কুড়ায় টাকা গোনে'।
শব্দপ্রেমীর সুখ আরও গহীনে
ভাব খুঁড়ে সে ভাষায় বোনে!
তাই আমারও আছে একটা দ্বীপ;
আমি সেই দ্বীপের মোহন-মুখশ্রীতে—
খুঁজে বেড়াই ভালোবাসার শব্দটিপ!
সেখানে আছো অনন্তের গান
সেখানে আছে নির্মল প্রেমের ছায়া।
সেখানে আছে জীবন ও যাপনের ঘ্রাণ
আছে কালচিত্রে কর্মমায়া!

আমি অবকাশ যাপনে সেই দ্বীপে যাই
আমি শ্বাস নিতে সেই দ্বীপে যাই
আমি প্রেম পেতে সেই দ্বীপে যাই।
আমি অসহায় ভিখারির মতোন,
ক্লান্ত পথিকের মতন সেই দ্বীপে যাই।
আমার দ্বীপে অনেক গল্প আছে,
আমার দ্বীপে আছে অজস্র বৃক্ষ
সেসব বৃক্ষের পাতায় পাতায় লেখা,
আমার মতন অন্য সব মানুষের কথা।
সেই দ্বীপে সুখ আছে, আছে ব্যাথা!
আছে যাবতীয় দর্শন,
হেমন্ত, শরৎ অথবা বর্ষার ঝরঝর বর্ষণ!
আমার দ্বীপের একটা অনুপম নাম আছে
সূর্যের মতো দীপ্ত সেই নাম—
চাইলেই যাকে কাছে পাওয়া যায়,
যেন বিশ্বস্ত দুটো হাত।
আমার দ্বীপের নাম—রবীন্দ্রনাথ

গল্পঃ স্মৃতি

প্রণব পাল
বিএ, ইংরেজি (সাম্মানিক), ৩য় বর্ষ

দেখতে দেখতে কলেজের তৃতীয় বর্ষ শেষ হতে চলল আমার। মাঝে মাঝে যখন একা থাকি, তখন যেন সামনের একাকিত্ব আমাকে গ্রাস করতে শুরু করে, আর তো ক'দিন পর কলেজ জীবন শেষ, শুরু হবে সেই ইঁদুর দৌড়, সেই চাকরির পিছনে দৌড়ানো, এখন যা আছে থাকবে সবই, শুধু থাকবে না এই সময়টা, এই মুহূর্তগুলো থেকে যাবে শুধু স্মৃতিগুলো...।

কলেজের প্রথম বর্ষে যখন ভর্তি হলাম, তখন সবাই অচেনা। স্কুল জীবনের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা যেনো আবার ফিরে আসলো। স্বভাবতই একা একা গিয়ে বসে থাকলাম এক কোনায়। স্কুল জীবনে যে মিশুকে ছিলাম না সেটাই যেনো আমাকে দেখেই বুঝতে পারতো সবাই, কয়েকটা বন্ধু পেয়েছিলাম স্কুল জীবনের, তাদের সাথে পরিচয় থাকলেও কথা হতোনা বেশি। এখন ওসব ছেড়ে বন্ধুত্ব করেছি। মিশতে মিশতে কবে বন্ধু হয়ে গেছি জানিনা। তারাই যেন এখন আমার সবচেয়ে কাছের, আরো কত বন্ধু পেয়েছি যাদের এক সময় আলাদা করে রাখতাম নিজের থেকে, নিজেকে আলাদা ভাবতাম, মনে হতো যেন আমি হয়তো মানিয়ে নিতে পারব না ওদের সাথে। হঠাৎ স্কুল থেকে কলেজের এই পরিবর্তনে ওরা সাথে থেকেছে বলেই হয়তো নিজেকে আর আলাদা মনে হয় না। স্কুল জীবন থেকে কলেজ জীবন যেন অনেকটাই আলাদা, ছেলে মেয়ে একসাথে বসে ক্লাস করা, গল্প করা— সব যেন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। কলেজ জীবনে এসে হয়তো অনেক ছেলে মেয়েরা নিজেদের সাথে মানিয়ে নিতে শুরু করে— অপরের মনোভাব, তাদের ব্যবহার, তাদের মানসিকতার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে শুরু করে— অতঃপর তৈরি হয় বন্ধুত্ব। আগের চেয়ে এই বন্ধুত্ব যেন অনেক গভীর, অনেক প্রিয়, নিজেদের কথা যেন সবাইকে বলা যায়, সবাই যেন
নিজের পরিবার।

স্কুলে থাকতে শুনতাম যে, কলেজে নাকি লেকচার দেয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা, তখন ভাবতাম শুনে শুনে কি মনে রাখা যায়, কী করে বা অত তাড়াতাড়ি সবাই নোটস লিখে ফেলে, কলেজে এসে ধারণার পরিবর্তন হলো বটে, কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে সম্পর্কটাও যেন আস্তে আস্তে বন্ধু সুলভ হতে শুরু করল। শ্রদ্ধা করেছি আবার ভয়ও পেয়েছি। তাদের থেকে প্রাপ্তজীবনবোধের ধারণা— আমাকেও যেন জীবন-দর্শন বুঝতে অনেকটাই সাহায্য করেছে।

বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, কলেজের উদ্যানে বসে গল্প করা, ক্যান্টিনের চা এর স্বাদ, কত সেলফি, কত মুহূর্ত—সব যেন আস্তে আস্তে অতীত হতে যাচ্ছে ঠিক যেমন করে স্কুল জীবনটাই অতীত হয়ে গেছে। এখন যেমন স্কুলের সামনে দিয়ে গেলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই পুরনো স্মৃতি, কয়েক বছর পর হয়তো এমন করেই কলেজ এর স্মৃতিগুলো ভেসে উঠবে, মনে হবে আবার চলে আসি ক্লাস করতে, আবার সেই চেনা মুখগুলোর পাশে গিয়ে শুরু করি গল্প, শুরু করি সেই হৈ-হুল্লোড় গুলো।

বিদ্যাসাগর

সুস্মিতা সরকার
এম.এ, প্রথম ষন্মাস (২০১৯-২০২০)

দেশমাতার মহান সন্তান
বিদ্যাসাগর তাহার নাম
উন্নত শির বিতণ্ডা বীর
বীরসিংহে তাহার ধাম
অশিক্ষার মোহ পানে
দেশ তবে পরিকল্পে
তাহার উদ্ধার কল্পে
নারী শিক্ষা প্রচলন হয়।

ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন দর্শন ও তার বাস্তবতা

অভি চক্রবর্তী, বি.এ, ইংরেজি (সাম্মানিক)

Victorian যুগের প্রখ্যাত কবি, লেখক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক Matthew Arnold বলেছিলেন যে, প্রত্যেকটি দেশের সাহিত্য হলো প্রকৃত অর্থেই সে সকল দেশের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার মুখপত্র তথা দর্পণও বটে। কথাটির বাস্তবিক গুরুত্বও অপরিসীম, কারণ আমাদের কোনো দেশের যে কোনো ভাষার সাহিত্যের ধারাকে বুঝতে গেলে সে দেশের তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতিকে সবার আগে বুঝতে হবে। আমাদের দেশেই সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হল ইংরেজী, যা আমাদের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও পরিচিত। ইংরেজি ভাষার সাহিত্য খুব গভীর মনোযোগ সহকারে খেয়াল করলে আমরা এই সাহিত্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন অসাধারণ মানব জীবনের মূল্যবোধ ও বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারব। বিভিন্ন পাঠের মাধ্যমে সেগুলি যথাযোগ্যভাবে একটু আলোচনা করা যাক।

দার্শনিকতা ও প্রখ্যাত নাট্যকার, কবি ও লেখক William Shakespeare যেন একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। তার বিভিন্ন নাটক যদি খুব ভালোভাবে পড়া যায়, তাহলে আমরা তার বাস্তব জীবন, অদূর ভবিষ্যৎ এবং সর্বোপরি মানবজীবনের সাথে যুক্ত হরেকরকমের দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি। তাঁর অন্যতম বিখ্যাত নাটক "Macbeth"-এর কথাই ধরা যাক। নাটকের মূল চরিত্র ম্যাকবেথের চরিত্রাঙ্কন এমন ভাবেই করা হয়েছে যাতে একজন সাধারন মানুষ তার গুণাবলীর সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করতে পারে। ম্যাকবেথ স্কটল্যান্ডের উচ্চবংশীয় এক "Thane" বা "জমিদার", যে খুব সৎও নয় আবার খুব অসৎ ব্যক্তিও নয়। ৩ জন ডাইনির দ্ব্যর্থবোধক কথার মানে ধরতে না পেরে তাদের ফাঁদে পড়ে, এবং অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে তার নৈতিক অধঃপতন হয় ও তিনি একজন ভালো ব্যক্তি থেকে অসৎ ব্যক্তিতে পরিণত হন। এখানে তিনি ম্যাকবেথের মাধ্যমে একজন মানুষের স্বাভাবিক চাওয়া-পাওয়া, রাগ-দুঃখ-অভিমান ও অত্যধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকার কী ফল হতে পারে এবং তা মানুষকে কীভাবে ধ্বংসের পথে যেতে প্রলুব্ধ করে তার যথাযথ বর্ণনা করা আছে। নাটকের পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যখন ম্যাকবেথ তার জীবনের অন্তিম ও চরমতম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, ঠিক সেইসময়ে অন্দরমহল থেকে তিনি খবর পান যে তার প্রিয়তমা স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হয়েছে, যা তখন তার ওই গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য এক চরমতম বাঁধা। উইলিয়াম শেক্সপীয়ার মহাশয় দেখিয়েছেন যে আসলে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে কী করে একজন মানুষ বাস্তব জগতের দর্শন বোধ সম্পর্কে আরও জ্ঞানী হতে শুরু করে। নাটকটিতে ম্যাকবেথের মুখ থেকে বলিয়েছেন এক চরম সত্যি কথা—

Tomorrow and to-morrow and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death."

(Act. Macbeth, Shakespeare)

"Life's but a walking shadow" বা জীবনকে একটি চলমান ছায়ার সাথে তুলনা করে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমরা যখনই এক একটা করে দিন অতিক্রম করছি, ঠিক তত করেই আমাদের জীবনের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল, যা হলো মৃত্যু, তার দিকে ক্রমেই নির্দিষ্ট ছন্দে এগিয়ে যাচ্ছি। এই অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা Bacon তাঁর "Of Death" প্রবন্ধে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন, কিন্তু তাদের দু'জনের বক্তব্য মোটামুটি একই। যদি আমরা জন্মের মত করে মৃত্যুকেও সমান দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারি, তাহলে মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের যাবতীয় ভয়-ভীতি ও দুঃখের পরিমাণ কমে যাওয়ার এক বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায়- যা অবশ্যই মানব জীবনের দর্শনের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও বটে।

এবার আসা যাক Victorian যুগের সাহিত্যে। Victorian যুগ হলো এমন একটি যুগ যা কিনা সু-পরিচিত ছিল একটি কথাতে, যা-হলো- 'ইংরেজদের সূর্য কখনো অস্তমিত হতে পারে না' অর্থাৎ ইংরেজরা নাকি অপরাজেয়! সেই যুগের সাহিত্য থেকে একটা দারুণ কথা শেখার ছিল, আর তা হলো মানুষের অদম্য মনোবলের জোরে মানুষ এই পার্থিব জগতের কত শত বাধা অনায়াসে অতিক্রম করতে

পারে। ধরা যাক, কবি Lord Alfred Tennyson-এর "Ulysses" নামক কবিতার কিছু লাইনকে—

"I will drink life to the bees"

অর্থাৎ এই লাইনের থেকে স্পষ্ট একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে, কবি বলতে চাইছেন যে, মানুষের এই স্বল্পমেয়াদি জীবনকালে সবকিছু জানা সম্ভব নয়, জীবনকে একটি সুরাপাত্রের সাথে তুলনা টেনে তিনি বলেছেন যে, জীবন যদি সুরাপাত্র হয়ে থাকে তবে সেই সুরাপাত্রের একদম তলানি পর্যন্ত পান করার লক্ষ্য নিয়ে প্রত্যেক মানুষের পথ চলা উচিত। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একদম মন ভরে উপভোগ করা উচিত—যা গ্রহণ করলে মানুষের জীবন আরোও সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। জ্ঞানের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়েও তিনি এই কবিতায় কিছু অসাধারণ লাইন বলে গেছেন 'Ulysses' এর মুখ দিয়ে —

"How dull it is to pause, to make an end,
To rust unburnished, not to shine in use!"

অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান যদি কোন ধারালো অস্ত্র হয়ে থাকে, তবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত উজ্জ্বল ও ধারালো থাকবে, ঠিক যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যবহার করা হবে, কারণ অস্ত্রের ব্যবহার কমে গেলে তাতে মরিচা পড়ে যায়— ফলে তখন তার থাকা আর না থাকা দুই সমান হয়ে যায়। জীবনে থেমে পড়া সহজ, কিন্তু বড়ই একঘেয়ে। তার চেয়ে তিনি বার্তা দিয়েছেন সমাজকে—

"To strive, to seek, to find and not to yield"

অর্থাৎ, সবসময় আমাদের উচিত উত্তম কিছুর জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, নতুন কিছু খোঁজা ও জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ করা, কিন্তু কখনোও ভেঙে না পরা, নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাওয়া—এগুলোই আসলে সাফল্যের সিঁড়ি।

ইংরেজি সাহিত্যের দার্শনিকতা ও বাস্তববোধ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে যার লেখায়, তিনি হলেন বিখ্যাত "Dramas of Ideas"— এর প্রবর্তক George Bernard Shaw. তিনি তার প্রত্যেক লেখাতেই চরম বাস্তব বোধ ও তীক্ষ্ন ক্ষুরধার বুদ্ধির এক অসাধারণ মিশেল পাঠকগণকে উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গরিব হওয়াটা চরমতম দোষের, যদি তুমি নিজের চেষ্টায় বড়লোক হওয়ার চেষ্টাই না করো ও আরও একটি কথা সমাজকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, টাকা উপার্জন খারাপ হোক বা ভাল উপায়ে, তা সবসময় ভালো কাজের জন্য যেন ব্যবহার করা যায়, একমাত্র তখনই দেশের মানুষের দুঃখ ঘুচবে।

পরিশেষে, একথা বলাই যায় যে, যদি কেউ হৃদয় দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের দর্শনকে বুঝতে পারে ও তার ব্যবহারিক দিককে নিজেদের জীবন পথের মার্গ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তা মানব জীবনের জন্যই লাভজনক হবে।

ভ্রম না সত্যি

পিয়ালী দেবনাথ, এম.এ. তৃতীয় ষন্মাস

নাম সনাতন, গ্রাজুয়েশন পাস, পিতা ভোলানাথ সেন। রাজবংশীয় বংশধর আমি। শুনেছি রাজ-রাজাদের নাকি খুব বুদ্ধি। বুদ্ধি করে তারা কত লোককে কত কলে ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমি এত হতবুদ্ধি হলাম কী করে ভেবেই পাইনা। বার বার ঠকছি! ঠকছি! ঠকছি! আর ঠকছি! তবু মানুষ রূপী প্রাণিগুলিকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই দেখেও ইচ্ছে করে। কেন এমন হয় বলতে পারব না। ভগবান হয়তো ঠকবার জন্যই আমাকে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন। আসলে ঠকবার জন্যও কাউকে তো চাই। নইলে ঠকবাজ লোকগুলো কোথায় যাবে বলতো?

যাইহোক, এখন আমি চলেছি শাহিপুর গ্রামে। আমার পূর্ব-পুরুষদের বাড়ি অর্থাৎ রাজবাড়ী। ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে চলেছি। বাবা-মা চাকরির সূত্রে কোলকাতা থাকায়, আমিও সেখানে থাকতাম আর কী... জীবনের ধাপে ধাপে বহু মানুষের আগমন ঘটেছে, স্বভাবগতভাবে বিশ্বাস করেছি আর ঠকেছি। তাই চলেছি চির পরিচিত সেই স্থান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। মনের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত কষ্ট,

সমস্ত ভুল-ত্রুটি। সমস্ত অবিশ্বাস, সমস্ত ভাঙা-গড়া দূরে ফেলে আসতে।

দীর্ঘ যাত্রাপথ সুন্দরভাবে অতিক্রম করে আমি সবেমাত্র শাহপুরের মাটিতে পা দিলাম। পা দেওয়ামাত্র বেশ হালকা লাগছে নিজেকে। ভারি অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। এখানকার জঙ্গল রাস্তা যেন আমাকে টানছে। ...দূর থেকে কে যেন হেঁটে আসছে। চওড়া গোপ, ধুতি পরিহিত। লোকটি আমার কাছে এসে বলল—

'আপনি সনাতন বাবু?'

আমি বললাম—

'হ্যাঁ—আপনি?'

'আমি রঘু বাবু। আপনাদের ঐ রাজবাড়ির দেখাশোনা করি। আপনি আসবেন শুনে সব ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছি। দেন-দেন, আপনার হাতের ঐ ব্যাগখানা আমাকে দেনতো দেখি।'

—সে এক প্রকার আমার হাত থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিল। এরপর সে বলল—

"আপনাদের বাড়িতে সবাই কুশলে তো বাবু?"

আমি বললাম—

"হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা। তা তোমাদের এখানে সবাই কেমন আছে?"

সে জানায়—

"কেমন আর থাকব বাবু— আপনাদের দয়ায় ঐ... চলে যাচ্ছে।"

—রঘুর সাথে কথা বলতে বলতে রাজবাড়ি পর্যন্ত চলে এলাম, এরপর হঠাতি রঘু অদ্ভুতুভাবে বলে উঠলো—

"রাতে কিন্তু আপনাকে একাই থাকতে হবে এ বাড়িতে"

"কেন?"

"কি করবো বাবু?... কেউ যে থাকতে রাজি হচ্ছে না। আর আমাকেও রাতে বাড়ি যেতে হবে বাবু, মেয়েটা যে একা আছে।"

এরপর সে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই আমার হাতের আমার ব্যাগটি ধরিয়ে দিয়ে পিছন ঘুরে হাঁটতে হাঁটতে বললো—

"সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বাবু, আমি আপনার রাতের খাবারটা নিয়ে আসি"

রঘুর এমন অদ্ভুত আচরণ দেখে আমি এক মিনিট স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। যাইহোক, আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। এই বিশালাকার বাড়িটা ঘুরে দেখতে দেখতে আমি একটি ঘর খুব সাজানো-গোছানো দেখলাম। বুঝলাম— এটাই বোধহয় আমার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঘরে প্রবেশ করে, আমার ব্যাগটি এক কোণে রেখে আমি বিছানার উপর নিজেকে একপ্রকার ঢেলে দিলাম।

আ: কি আরাম লাগছে...

"বাবু-বাবু!"

"কে, রঘু?"

"হ্যাঁ, বাবু। আপনার খাবার বিছানার পাশে এই টেবিলের উপর রাখলাম।"

এবার খুব দ্রুত বললাম—

"রঘু, শোনো—"

"আজ্ঞে বাবু—"

"তুমি কি খুব ব্যস্ত?"

"আজ্ঞে, না... মানে—"

"কী?"

"আসলে... এ বাড়িতে, এ বাড়িতে... তেনারা আছেন।"

"মানে?"

"কিছুনা—কিছুনা।"

এরপর রঘু পিছন ঘুরে, চারিদিকে ঘুরে দেখে, রাম নাম জপ করতে করতে দ্রুততার সঙ্গে চলে গেল। আমি একটু আশ্চর্যই হলাম। তারপর আমি আমার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালার গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ মৃদু-মন্দ বাতাস বয়ে চলছিল। হঠাৎ চোখে পড়লো— বাড়ির পিছন দিকটার ঐ পুষ্করিণীটি, ঘাট বাঁধানো, বসার জায়গা করা। ঐ পুষ্করিণীটি যেন আমার মনকে প্রবল বেগে টানতে লাগল। আমিও ছুটে গেলাম, গিয়ে বসলাম ঐ ঘাট বাঁধানো সিঁড়ির উপর। শীতল বাতাস শরীরে লাগায়, আমার শরীরে যেন নিজেকে ওই স্থানে ছেড়ে দিল, আর আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি আমার চৈতন্য ফিরে পেলাম। কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাকলো, একটা নারী কণ্ঠ। কোথায়, কেউ নেই তো! তবে কে ডাকলো আমায়? আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাউকেই দেখতে পেলাম না। আমি

চিৎকার করে বললাম—
"কেউ কি আছেন?"
—কোন উত্তর নেই। আমি আমার মনের ভুল ভেবে শান্ত হয়ে বসলাম। এরপর বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন ভাবছি— এবার খিদেটা বেশ জমিয়ে পেয়েছে, খেতে যাব, তখনি আকাশে-বাতাসে একটা হাসির রোল উঠলো। এবার একটা নয়, অনেকগুলি কণ্ঠ। ভেতরে ভেতরে কেমন যেন আঁতকে উঠলাম, কেমন যেন কেঁপে উঠলাম। আবার-আবার ঐ শোনা যায়—
"হাঃ —হাঃ —হাঃ —হাঃ —হাঃ"
— কেমন যেন করছে শরীরের ভেতরটা। আমি কি ভয় পেলাম? না, না আমি ভয় পাইনি, আমি ভয় পেতে পারিনা। নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম— Cool down সনাতন, don't worry. এরপর সব আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আবার চমকে উঠলাম, কেউ বলছে—

"সনাতন... পুষ্করিণীর দিকে তাকাও সনাতন। আমি জানি—তোমার খুব দুঃখ। আমাতে ডুবে যাও সনাতন। আমি যে পুষ্করিণী। হাঃ —হাঃ —হাঃ

—আমি লাফ দিয়ে খাট থেকে উঠে পড়লাম। আমার শরীরের লোম কূপ থেকে যেন জলের ধারা বয়ে যেতে থাকলো। এক দৌড়ে আমি আমার ঘরে ছুটে গেলাম। ঘরে গিয়ে ওই জানালার নিচে গুটিসুটি হয়ে চুপ করে বসে পুষ্করিণীর দিকে লক্ষ্য করছিলাম, এমন সময় আমার Alarm ঘড়িটায় চারটের ঘন্টা বেজে উঠলো। আমি দৌড়ে গিয়ে সেটি বন্ধ করে বিছানায় বসলাম। Alarm বন্ধ করার পরও ঘড়িটা ঘণ্টাধ্বনি যেন দীর্ঘক্ষণ রাজবাড়ির প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দিয়ে এল—সকাল আসন্ন।...
'টং —টং —টং!' রাজবাড়ির ঘড়িতে ছটার ঘন্টা বাজলো। বিছানার উপর শুয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম— বুঝতেই পারিনি। চোখ পড়লো বিছানার পাশে টেবিলের উপর রাখা খাবারের উপর। কাছে গিয়ে দেখলাম—খাবারটা খারাপ হয়ে উঠেছে। ইস্, এত খিদে পাওয়া সত্ত্বেও রাতে এই খাবারের কথা একবারও মনে হয়নি। ইতিমধ্যে রঘু এস দোরগোড়ায় হাজির হয়ে একগাল হাসি নিয়ে বললো—
"রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তো?"
"রঘু... আর বোলো না! আজই আমি কলকাতা ফিরব। বুঝলে?"
"সে কি বাবু, আপনার তো এখানে কয়েকদিন থাকার কথা?"
"হ্যাঁ, সেই রকমই তো ইচ্ছা ছিল রঘু। তবে ঐ...ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই যে, চলো এখনি বেরিয়ে পড়ি"।
"আপনি খাবেন না বাবু?"
"না, রঘু।"
"আর আপনার ব্যাগ?"
"ব্যাগ গোছানোই আছে। কাল রাতে ব্যাগ খোলায় হয়নি। চলো"।
"আজ্ঞে বাবু। আপনার ব্যাগটি আমায় দেন।"
"হু, এই নাও।"
— এরপর আমরা রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের বড় রাস্তায় উঠে এলাম। আমি লক্ষ্য করলাম— সামনের বট গাছের আড়াল থেকে কেউ বোধ হয় আমাদের নিরীক্ষণ করছে। রঘু বোধ হয় লক্ষ্য করেনি, তাই আমি ওকে ডেকে বললাম—
"রঘু দেখতো সামনে ওটা কি?"
"কোথায় বাবু?"
"ঐ যে, ঐ বটগাছটার আড়ালে। আমাদের দেখে নিজেকে লুকাচ্ছে মনে হচ্ছে!"
"ও: ওটা। ওটা আমার ভাইগো বাবু। আর বলবেন না— দিন নেই, রাত নেই, ভুত-প্রেত সেজে ওকে ভয় দেখাচ্ছে। কাজের সময় তাকে কাছে পাওয়া যায় না। এক মুহূর্ত স্থির হয় না সে। আসুক আজ বাড়ি, ওর মজা দেখাবো।"
"বুঝলাম!"
"এই যে বাবু স্টেশন এসে গেছে। আপনি সাবধানে যাবেন।"
"তুমিও ভালো থেকো রঘু।"
—এরপর আমি ট্রেনে উঠে পড়লাম।

নাটক: (অন্তঃসলিলা) ফল্গু

রচনা: জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়
ল্যাব এটেনডেন্ট (পদার্থ বিভাগ)

চরিত্র:

মনীশ (অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)
মনোরমা (মনীশের স্ত্রী)
শমিক(মনীশের পুত্র)
সুমিতা (শমিকের স্ত্রী)
বিভাস (শমিকের বন্ধু)
অলোক (শমিকের বন্ধু)
একজন অফিস স্টাফ

[এক ঝড় বৃষ্টির রাত। কলকাতার রাস্তায় একটা ডাস্টবিনের পাশ থেকে একটি সদ্যজাত শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে এক রিকশাওয়ালা তাকে তুলে নেয়। এদিক ওদিক কাউকে দেখতে না পেয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে চলে যায়। মিউজিক থামে ও মঞ্চ অন্ধকার হয়।]

[পুনরায় আলো জ্বললে দেখা যায় একটি সাজানো গোছানো ঘর। একপাশে একটি রিডিং টেবিল এবং চেয়ার। তাতে একটা খবরের কাগজ আর খালি কাপ ডিস। শাঁখের আওয়াজ শোনা যায়। মনোরমা দেবীর প্রবেশ। হাতে পুজোর উপকরণ। জ্বলন্ত ধূপ, ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। নমস্কার করেন।]

মনো: নমস্কার। এই হলো আমাদের সংসার। আমাদের মানে রায় পরিবারের সংসার। এই সংসারে আমি হলাম গৃহকর্তী। আমার নাম মনোরমা, মনোরমা রায়। আর যারা আছেন তারা হলেন... আচ্ছা ঠিক আছে, এইভাবে নয়। একটু পরে তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আগে আমার কথা বলি। (মণীশ রায়ের প্রবেশ। চেয়ারে বসেন ও কাগজ পড়তে থাকেন।) আমার স্বামী, মণীশ রায়। আগে একটা কলেজে পড়াতেন। এখন রিটায়ার্ড করেছেন। (মনীশকে) একি! কাগজ পড়তে শুরু করলে? বাজারে যাবে না? আজ রবিবার ছুটির দিন বলে কি খাওয়া দাওয়ারও ছুটি নাকি? এত দেরি করছ কেন? বৌমা এখনো চা দেয়নি? (মনীশ বাবু খালি কাপের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়েন) সে কি! এত বেলা হল! বলিহারি আক্কেল। বৌমা বৌমা।

মনীশ: আহা, আবার বৌমাকে ডাকছো কেন?

মনো: ডাকবো না? এত বেলা হল এখনো চা দেয়নি কেন জিজ্ঞাসা করব না?

মনীশ: রোজ রোজ কি রুটিন মতন হয় নাকি? (মজা করার ভঙ্গিতে) দেখো হয়তো এখনো ঘুমোচ্ছে। যা ঘুমোতে পারে না, তোমার বৌমা। কোথায় সকাল সকাল উঠে এদিকটা সামলাবে তা না। পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

মনো:(থামিয়ে দিয়ে) বেলা দুপুর হয়ে গেল, এখনো ঘুমাচ্ছে! না: যাই দেখি—

মনীশ: তা চা টা তো তুমিও করে দিতে পারতে না কি?

মনো: কি বললে? তিনি বেলা অব্দি ঘুমাবেন, আর আমি পুজো আচ্ছা ফেলে রেখে চা করতে বসবো? (আরও জোরে) বৌমা বৌমা।

মনীশ: আহা, শোনোই না।

মনো: কি শুনব শুনি? বাড়িতে পয়া-অপয়া, লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী বলে কিছু নেই না কি? বাড়ির বৌ, এত বেলা হল, এখনো ঘুম ভাঙেনি? দেখাচ্ছি মজা। (মনীশ বাবু মুচকি হাসেন,

সেটা দেখে আরও রেগে যান) এই, তোমার আস্কারা পেয়ে এই হচ্ছে। খালি 'ও মা, হ্যাঁ মা, ঠিকই তো মা', বুঝবে পরে, আগে আমি চোখ বুঝি। বৌমা, বৌমা ।

(সুমিতা প্রবেশ করে। দেখে বোঝা যাচ্ছে সবে চান করেছে। পরিপাটি সাজগোজ, তবে বাহুল্য নেই। কপালে জ্বল-জ্বল করছে সিঁদুরের টিপ। হাতে চা এবং বাজারের ব্যাগ)

সুমিতা: আমাকে ডাকছেন মা?

মনো: কি করছিলে? চান করা তো হয়ে গেছে দেখছি। তা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এত বেলা হলো, তোমার শ্বশুর মশাইকে এখনো চা দাওনি? কি আক্কেল গো তোমার? আমার হাতে যখন এ সব ছিলো, তখন তো পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিলো না। চেঁচিয়ে বাড়ি মাত। চা কই, চা কই, চা চা চা।

সুমিতা: চা! আমি তো বাবাকে সকালেই চা দিয়েছি! বাবা?

মনীশ: আচ্ছা মনোরমা, তোমার চোখটা কি খারাপ হয়ে গেলো? না মাথাটা? দেখছো সামনে খালি কাপ ডিস, আর চা চা বলে সাত সকালে চেঁচাতে লাগলে? বলি এই চা টা কি ওপাড়ার পাঁচুগোপাল খেয়ে গেলো? এক্ষুনি একটা চোখের বা মাথার ডাক্তার টাক্তার দেখাও।

মনো: তা এই চা টা কার?

সুমিতা: এটা তো আপনার লিকার চা।

মনো: এটা আমার! ওঃ, তাইতো, লিকার চা। (মনীশকে) তা তুমি চা খাওনি বললে কেন?

মনীশ: যাঃ বাবা, আমি আবার কখন খাইনি বললাম?

মনো: বললে না?

মনীশ: মোটেই না। আমি শুধু ঘাড় নেড়েছি। আমি মুখ দিয়ে একদম মিথ্যে কথা বলি না।

মনো: বলোনি?

মনীশ: না একদম না। ঘাড় নাড়া আর মুখে বলা, মোটেই এক জিনিস না। (হেসে) আসলে হঠাৎ ইচ্ছে হলো এই সুযোগে সেই চিরকালীন বাঙালি কালচার শাশুড়ি-বৌমার তু-তু ম্যায়-ম্যায় ঝগড়াটা একটু শুনি। কিন্তু তা আর হলো না। বৌমা আমাদের একদম ঝগড়া করতে পারে না।

মনো: কি বললে, আমি শুধু ঝগড়া করি?

সুমিতা: আমি বুঝতে পেরেছি বাবা।

মনীশ: কি বুঝতে পেরেছো?

সুমিতা:(মুচকি হেসে) আপনার আর এক কাপ চা দরকার।

মনীশ: ইয়েস, এতক্ষণে তুমি ঠিক ধরেছো। এই না হলে প্রফেসর মনীশ রায়ের বৌ মনোরমা রায়ের বৌমা। এইজন্যেই তোমায় বলি মা। তোমার শাশুড়ি ধরতেই পারেনি ব্যাপারটা। হা, হা, হা।

সুমিতা: আমি এক্ষুনি আনছি। মা, এই বিস্কুট দুটো খেয়ে নিন। খালি পেটে চা খেলে গ্যাস হয়ে যাবে। দেখুন তো চিনি আর দেবো? (মনোরমা ঘাড় নাড়ে) ও হ্যাঁ, আপনার খাটের পাশে আপনার প্রেশারের ওষুধ আর জল রেখেছিলাম, খেয়েছেন? (মনোরমা সম্মতি জানায়) বাবা চা খেয়ে এবার আপনি বাজারে যান। নইলে দেরি হয়ে যাবে। ও হ্যাঁ, একটু চিংড়ি মাছ আনবেন তো।

মনীশ: চিংড়ি মাছ! ওরে বাবা, সে তো অনেক দাম? ওই টাকায় নাকি আজকাল মহাকাশে ঘুরে আসা যায়! তা, মালাইকারি হবে বুঝি?

সুমিতা: না, মা কাল নারকেল চিংড়ির কথা বলছিলেন তাই।

মনীশ: কে বলেছেন? মা? ওরেব্ববা। তোমার শাশুড়ি যখন বলেছেন তখন না আনলে আমি কি আর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব? (সুমিতা মুচকি হেসে ভিতরে চলে যায়)

মনো: তোমাকে একটা কথা বলব?

মনীশ: বলো। অত ইতঃস্তত করছ কেন?

মনো: বৌমাকে অতটা প্রশ্রয় দিও না।

মনীশ: প্রশ্রয়! প্রশ্রয় বলছ কেন মনোরমা? আরে ও আমাদের বৌমা, আমাদের একমাত্র ছেলের বউ। মনোরমা, আমি জানি, তুমি কেন এ কথা বলছ। শমিক যে আমাদের ওপর ডিপেন্ড না করে, নিজের পছন্দে ভালোবেসে সুমিতাকে বিয়ে করেছে, এটা তুমি মন থেকে মেনে নিতে পারোনি, তাই না?

মনো: হ্যাঁ, পারিনিই তো। আমাদের একমাত্র ছেলে। বুকের রক্ত জল করে মানুষ করেছি আমরা। সে আমাদের মুখের দিকে চাইল না! ও কে? ওর পরিচয়, ওর বংশ, কিছুই জানতে পারলাম না, শুনতে পারলাম না? অফিসে যাওয়ার

পথে পরিচয়, অমনি হুট করে ছয় মাসের মধ্যে বিয়ে করে ঘরে এনে তুলল? তাও কোন অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান নয়, রেজিস্ট্রি করল। আমরাই যা রিসেপশন দিলাম।

মনীশ: আঃ মনোরমা, আস্তে বল, বৌমা শুনতে পাবে।

মনো: পাক, আমি গ্রাহ্য করি না। সত্যি বলতে আমার ভয় নেই।

মনীশ: মনোরমা, তবু ও এখন আমাদের বাড়ির বউ। ওর হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ সব কিছুর সঙ্গে আমরা জড়িয়ে গিয়েছি। আচ্ছা মনোরমা, বলোতো, একদিন তুমিও ঠিক এই বয়সে এই বাড়ির বউ হয়ে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন প্রথম এলে, তখন তুমিও কি অকূল সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে এ সংসারের প্রতিটি বস্তুকে, প্রতিটি প্রাণীকে আঁকড়ে ধরতে চাওনি?

মনো: কি বলতে চাও বল তো?

মনীশ: তোমার তো তাও বাপের বাড়ির দিকের সবাই ছিলো। কিন্তু বৌমার? মা নেই, বাবা নেই। কে আছে ওর, আমরা ছাড়া? তুমিই তো ওর মা হতে পারতে? কি হবে ওর পরিচয় আর বংশ মর্যাদায়?

মনো: এই টাই তো আমার দুঃখ। আমার অশান্তি। শমিক না পেলো শ্বশুর বাড়ির খাতির, না পেল আদর যত্ন। না পুজোর তত্ত্ব, না জামাই ষষ্ঠী। বংশ মর্যাদা কি হবে! তোমার ওই সব বক্তৃতা পাড়ার ফাংশনে গিয়ে দিও। হাততালি পাবে। এখানে নয়। এটা সংসার, কঠিন বাস্তব সংসার। পাঁচটা মানুষকে নিয়ে চলতে হয় আমাকে।

মনীশ: তোমার ওই পাঁচজন তো দুপুরের মহিলা মহল। বাদ দাও ওদের। ওদের সবাইকে আমি খুব ভালো করে চিনি। (সুমিতার প্রবেশ। হাতে চা)

সুমিতা: বাবা, আপনার চা। আজ চায়ে চিনি ঠিক ছিল মা?

মনীশ: (চা খেতে খেতে, হেসে) ওই দু এক চামচ তোমার মায়ের মুখ মিষ্টি করতে পারবে না বৌমা, দেখছি তো কত বছর।

মনো: হ্যাঁ তাতো হবেই। জন্মের সময় তোমার মা তোমার মুখে দিয়েছিল ডাবরের মধু, আর আমার মা আমাকে দিয়েছিল নিম ফুলের মধু। তাই তো আমার এখনো সুগার হয়নি। বুঝেছ? যাও, সকাল সকাল বাজারটা করে নিয়ে এসো। (গজগজ) যত্তসব। খালি পিছনে লাগা।

মনীশ: ওঃ হ্যাঁ, বৌমা ব্যাগটা দাও তাড়াতাড়ি। (সুমিতা কে) রেগে গেছে, সাবধান।

সুমিতা: (হেসে) চিংড়ির কথাটা ভুলবেন না কিন্তু।

মনীশ: (চটি পড়তে পড়তে) তাই আর ভুলি? মা অন্নপূর্ণার আদেশ বলে কথা। (মনোরমা কটমট করে তাকায়। মনীশ দ্রুত প্রস্থান করে)

সুমিতা: (চায়ের সরঞ্জাম নিতে নিতে) মা, প্রেসারের ওষুধটা খেয়েছেন তো?

মনো: হুম খেয়েছি। (সুমিতা প্রস্তোনোদ্যতা) বৌমা,

সুমিতা:(ফিরে) হ্যাঁ বলুন মা।

মনো: শমু এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি?

সুমিতা: (একটু থমকে ইতস্ততঃ করে) না, মানে কাল ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তো, তাই আর ডাকিনি।

মনো: শমু আজকাল প্রায়ই রাত করে বাড়ি ফিরছে। কেন, তা কিছু বলেনি তোমাকে?

সুমিতা: না, সেরকম কিছু বলেনি। শুধু বলছিল, অফিসের কাজের চাপ বেড়েছে, ইয়ার এন্ডিং। সবাইকে কাজ উঠিয়ে তারপর ফিরতে হয়।

মনো: হুম, আর একটা কথা।

সুমিতা: বলুন।

মনো: (একটু থেমে) একটা কথা সবসময় মনে রাখবে, আত্মীয়তার সহজেই গড়ে তোলা যায়, আত্মার বন্ধন গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়।

সুমিতা: মা, কি বলছেন আমি ঠিক!

মনো: এ বাড়ির মান-সম্মানের ভার এখন তোমার হাতেও। এ বাড়িতে যাদের অবাধ যাতায়াত, তাদের প্রতি তোমার ব্যবহার কেমন হবে, তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলতে হবে না। (সুমিতা চুপ) কাল খোকার বন্ধু তাপস এসেছিল। বিয়েতে আসতে পারেনি। তোমার সাথে পরিচয় করার ইচ্ছে ছিল। অনেক ডাকাডাকি করেও শমু তোমাকে তার সামনে পর্যন্ত আনতে পারল না। সে অসন্তুষ্ট হয়ে মিষ্টিটা পর্যন্ত না খেয়ে চলে গেল।

সুমিতা: বিশ্বাস করুন মা, কালকে আমি, মানে আমার

শরীরটা, মানে আমি মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম।
মনো: ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি তোমার মাথা ধরেছিল। কিন্তু মাত্র আধঘণ্টা পরেই যখন তোমার শ্বশুরের বন্ধু রামজীবন বাবু এলেন, আর বৌমা চা বলে হাঁক দিলেন, তখন কিন্তু তোমার মাথার যন্ত্রণাটা আর ছিল না!
সুমিতা: ওঃ ভগবান, আমি কি করে বোঝাবো!
মনো: তুমি কি করে বোঝাবে, না বোঝাবে, সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু একবার যখন এ বাড়ির বউ হয়ে এ বাড়িতে এসে উঠেছ, সে যে ভাবেই হোক, তখন তার মর্যাদা রক্ষার ভার তোমারই।
সুমিতা: মা, আপনার কথা ঠিক।
মনো: নিশ্চই বুঝতে পারছ। সেটুকু বোঝার মত শিক্ষা এবং বুদ্ধি, তোমার আছে, আমি জানি। এ বাড়ির বউ-এর দায়িত্ব অনেক।
সুমিতা: (একটু মরিয়া হয়ে) আমি কিন্তু যেচে এ বাড়ির বউ হয়ে আসিনি মা, আপনার ছেলে—
মনো: থাক, আমার ছেলের কথা তোমার আমাকে বলতে হবে না। আমার ছেলেকে আমি চিনি। বড় বেশি আবেগপ্রবণ সে। হঠাৎ করে আগু পিছু না ভেবে কাজ করে বসে ও। অফিসে যাওয়ার পথে তোমাকে দেখলো, তোমার কেউ নেই, অসহায়, আবেগ তাড়িত হয়ে বিয়ে করে বসল। আমরা ঢাকার বিক্রমপুরের বদ্যি বংশ। জাতের খোঁজটা পর্যন্ত নিলো না!
সুমিতা: এসব কথার আমি কি উত্তর দেব। এ সব তো আপনার ছেলেকে বলার কথা।
মনো: এখানে আমাদের একটা সমাজ আছে। পাঁচটা মানুষের সঙ্গে মিশতে হয় আমাদের। আত্মীয় স্বজনের কাছে কী পরিচয় দেবো তোমার?
সুমিতা: মা!
মনো: তোমার বাড়ি ঘর, আত্মীয়-স্বজন, বংশ পরিচয়, কিছুই তো জানা নেই আমাদের।
সুমিতা: কেন মা, আপনার ছেলে কি আমার সম্পর্কে কিছুই জানায় নি? প্রায় কেউই নেই আমার। খুব ছোটবেলায় বাবা মা মারা গেছেন। আমার কাকা খুব সাধারনভাবে আমাকে মানুষ করেছে। আমি খুব কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছি। কোনমতে গ্রাজুয়েশানটা শেষ করেছি।
মনো: হ্যাঁ, এ সব জানি। কিন্তু তারপরেও অনেক কিছুই জানার থাকে বউমা! (হাতের ব্রাশে পেস্ট লাগাতে লাগাতে শমিক প্রবেশ করে। পরনে রাতের পোশাক।)
শমিক: সুমিতা, সুমিতা। আজ আমি একটু সকাল বেরোবো কিন্তু।
সুমিতা: তুমি তৈরী হয়ে নাও। আমি এক্ষুনি জল খাবার করে দিচ্ছি। (প্রস্থান)
মনো: শমিক, এ দিকে শোন।
শমিক: বলো।
মনো: এখন তো তোর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, বড় হয়েছিস। আর কতদিন?
শমিক: কি কতদিন?
মনো: আঃ, তুই কি কোনদিনই কিছু বুঝতে চাইবি না?
শমিক: ওঃ মা, তুমি না আবার ঠিক ওই ভাবে কথা বলতে শুরু করলে, যেন আমি এখন ক্লাস ফাইভে পড়ি।
মনো: ঠিকই তো। যদি বড় হতিস, তাহলে অন্তত আজকের রবিবারের এই ছুটির দিনটায় ওই বুড়ো লোকটাকে রেহাই দিয়ে তুই নিজে বাজারে যেতিস।
শমিক: মা, তুমিতো জানো যে, বাবা চিরকাল নিজে হাতে বাজার করতে ভালোবাসে। আলু, বেগুন, পটল, মোচার বিজ্ঞানসম্মত নাম অবধি বাবার মুখস্ত। আর তাছাড়া আজ যে একটু আমায় বেরুতে হবে মা, প্লিজ। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। সামনের রবিবার থেকে আমি সিওর।
মনো: কি সিওর?
শমিক:(সুর করে) যাবই, আমি যাবই, রবিবারের বাজারেতে, যাবই আমি যাবই—
(মায়ের হাত ধরে ঘুরে ঘুরে গাইতে থাকে। মনোরামা হেসে ফেলে।)
মনো: আচ্ছা বাবা ঠিক আছে। ঠিক আছে। কিন্তু এই সাত সকালে তুই এখন যাবি কোথায়? আর শুধু আজ? আগের ক'রবিবারও তো বেরোলি। ফিরলি আমাদের খাওয়ার পর।
শমিক: খু উ ব জরুরী একটা কাজে মা। পরে তোমাকে সব বলব। এখন যাই। দুপুরে ফিরে আজ আমরা সবাই একসঙ্গে খাব, কেমন।

মনো: আচ্ছা (শমিকের প্রস্থান। হাসি মুখে মনোরমা সে দিকেই তাকিয়ে থাকেন। বাজারের ব্যাগ হাতে মনীশ প্রবেশ করে।। বিষণ্ণ। মনোরমা তাড়াতাড়ি হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে) কি হয়েছে? তোমাকে এমন লাগছে কেন? ঘামছো! শরীর খারাপ লাগছে? বসো তো, এখানে বসো। একটু জল খাও। শমিককে ডাকি?

মনীশ: না না শমিককে ডাকতে হবে না। শরীর ঠিকই আছে। কিন্তু মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল গো।

মনো: কেন? কি হয়েছে?

মনীশ: কাল রাতে রমেশ বাবুর মেয়েটা মারা গেল।

মনো: সে কী! কী করে?

মনীশ: সম্ভবত আত্মহত্যা।

মনো: আত্মহত্যা! কেন? কি হয়েছিল? রমেশ বাবুর জামাই কি —

মনীশ: একজন স্বল্পশিক্ষিত বিত্তবান যুবকের যা যা গুণ থাকার কথা, সবই ছিল। মদ, জুয়া, মেয়েছেলে, স্ত্রীর উপর মানসিক অত্যাচার, সবই। আচ্ছা মনো, রমেশ বাবুর মেয়েটা আমাদের মলির বয়সি না?

মনো: হ্যাঁ, কয়েক মাসের বড়। কিন্তু রমেশ বাবু কেস করেছেন তো জামাইয়ের নামে?

মনীশ: না।

মনো: না! কেন? ও রকম একটা লম্পটকে তো উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত!

মনীশ: হ্যাঁ, দেওয়া উচিত। কিন্তু দিতে পারছেন না, ছোট ছোট দুটো নাতি-নাতনীর কথা ভেবে। এটাই তো জীবনের বিয়োগ অংক মনোরমা, বিয়োগ হয়ে গেলেও হাতে একটা এক থেকে যায়। যা দিয়ে পরবর্তী বিয়োগের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। জানো, আজ আমার খালি মলির কথা মনে পড়ছে।

মনো: মলি! হ্যাঁ গো, মলির স্মৃতি আমাদের বুকের মধ্যে ধিকি ধিকি তুষের আগুন হয়ে জ্বলে। শুধু হঠাৎ কোনো ঘটনায় সেটা উসকে ওঠে।

মনীশ: মনোরমা, আমার খালি মনে হয়, যদি আমরা হরিদ্বার না যেতাম, তবে তো খুকিকে হারাতে হতো না?

মনো: হ্যাঁ, এই ডিসেম্বরে পঁচিশ বছর হলো তাই না? কতদিন। তবু সে দিনটার কথা চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে। সন্ধ্যেবেলা ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গা পূজার প্রদীপ ভাসাতে গেলাম। শমির নামে একটা, মলির নামে একটা।

মনীশ: ছেলেটা হাততালি দিয়ে লাফাচ্ছিল।

মনো: ওপরে তোমার কাছে ছিল শমি আর ও। হঠাৎ আমি ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে জলে পড়ে গেলাম। তুমি ওদের ওখানে ওখানে রেখে ছুটে গেলে আমাকে ধরে তুলতে।

মনীশ: কতটুকু সময়? ওপরে উঠে এসে দেখলাম শমিক একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। কিন্তু মলি নেই। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। কত থানা পুলিশ করা হলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। কর্পূরের মতন উবে গেল মেয়েটা।

মনো: আচ্ছা, কিভাবে নিলো বলোতো মেয়েটাকে?

মনীশ: গাঢ় শীতের সন্ধ্যা। দু বছরের ছোট্ট তুলতুলে শরীরটা, হয়তো মুখ চেপে ধরে চাদরের তলায় করে নিয়ে গেছে।

মনো: নিয়ে গেছে! কোথায়? কোথায় নিয়ে গেছে? ও কি বেঁচে আছে?

মনীশ: কোথায় আবার! হয়তো কারো কাছে অনাথ হিসাবে মানুষ হচ্ছে, নয়তো বিক্রি করে দিয়েছে অন্ধকার জগতের কোনো অন্ধকার গুহায়। কোনো গলিতে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দের ধরার জন্য। (কান্না)

মনো: না না, ও কথা বোলো না। আমি সহ্য করতে পারি না। তার চেয়ে বল, ও মরে গেছে। (কান্না)

মনীশ: আচ্ছা মনরমা, আজ যদি তোমার মলি হঠাৎ সারা গায়ে অন্ধকার জগতের কালি মেখে ফিরে আসে, কি করবে তুমি? সে তো আমাদের মেয়ে। ফিরিয়ে দেবে, না ঘরে নেবে তাকে?

মনো: জানি না, জানি না আমি কি করব! [কান্নায় ভেঙে পড়ে। মনীশ মনোরমার মাথায় সান্ত্বনার হাত রাখে। মনোরমা নিজেকে সামলায়। চোখ মুছে বাজারের ব্যাগ নিয়ে প্রস্থান করে। মনীশ চেয়ারে এসে বসে পড়ে। শমিক বেরোবার পোশাক পড়ে ভেতরে প্রবেশ করে। জুতো পরতে থাকে।]

মনীশ: শমু, আজও কি তোর ফিরতে দেরী হবে?

শমিক: না। কেন বলতো? দরকার আছে কিছু?
মনীশ: তোর আজকাল প্রায়ই ফিরতে দেরি হচ্ছে। রবিবারেও সকাল সকাল বেরিয়ে যাস। এসব নিয়েই তোর সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা ছিল।
শমিক: জরুরী কথা! বল না, এখন-ই বল।
মনীশ: তোর ফিরতে এত দেরি হয় কেন? কোথায় যাস?
শমিক: ইয়ে, হ্যাঁ, মানে ওই মিটিং টিটিং থাকে আর কি।
মনীশ: মিটিং? প্রায় রোজই? কিসের?
শমিক: বাবা, আমি একটা, মানে, ও তোমার জানতে হবে না।
মনীশ:(হঠাৎ চিৎকার করে) হ্যাঁ, আমাকেই জানতে হবে। কোথায় যাচ্ছিস, কি করছিস, সব আমাকেই জানতে হবে।
শমিক: (অবাক হয়ে) তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন বাবা? এত উত্তেজিত হয় না। তোমার শরীর খারাপ করবে।
মনীশ: (একটু শান্ত হয়ে) দেখ শমু, তুই আমার ছেলে। তুই এমন কিছু করতে পারিস না, যাতে আমার বা আমাদের মুখ নিচু হয়।
শমিক: বাবা, আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।
মনীশ: দেখ, আমাদের সংসার খুব দুর্লভ সুখ দিয়ে মোড়া। এই সুখ কিন্তু খুব ঠুনকো, ভঙ্গুর। একটু ঠোকা লাগলেই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। আমি কিন্তু আকাশের কোণে একটা কালো মেঘের ছায়া দেখতে পাচ্ছি শমু। হয়তো খুব শিগগির একটা ভয়ঙ্কর ঝড় উঠবে।
শমিক: বাবা, কি হয়েছে বলোতো।
মনীশ: তুই জানিস না?
শমিক: না!
মনীশ: তুই প্রায়ই অফিসের পর কোথায় যাস?
শমিক: কেন বলতো?
মনীশ: আমার প্রশ্নের জবাব দে। প্রশ্ন করিস না। ছিঃ শমু, ছিঃ। তুই না আমার ছেলে? আমি সারা জীবন ধরে কলেজে পড়িয়ে বহু ছেলে মেয়েকে প্রকৃত মানুষ হবার শিক্ষা দিয়েছি। তাদের কেউ কেউ আজ প্রতিষ্ঠিত, বরেণ্য। তাদের কারও কারও সঙ্গে আজও দেখা হয়ে গেলে, প্রণাম করে, শ্রদ্ধা দেখায়। আর গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে। আর তুই আমার ছেলে হয়ে কি না ওই সব নিষিদ্ধ পাড়ায় যাতায়াত করিস?
শমিক: (চমকে ওঠে) তুমি বিশ্বাস করো বাবা, আমি কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ওখানে যাই না। তুমি সব শুনলে হয়তো—
মনীশ: আমি বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের নাগরদোলায় ঘুরে মরছি। এক এক সময় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তুই, কিন্তু একজন দুজন নয়, অনেকেই ওখানে তোকে যেতে দেখেছে। এমনকি বিভাসও।
শমিক: বিভাস? কিন্তু ও তো সব জানে। আমি ওকে বলেছি।
মনীশ: তা আর কে কে জানে?
শমিক: তোমার বৌমাও জানে।
মনীশ: বৌমা! বৌমা জানে মানে? সুমিতা তোকে ও পাড়ায় যেতে মত দিয়েছে?
শমিক: নিশ্চই। বাবা, আসলে তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারনি। আমিই তোমাদের বলিনি। আমি ওই পাড়ায় যাই ঠিকই, তবে সে যাওয়াটা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে নয়। আমি একটা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছি বাবা, যাদের প্রধান কাজ হলো সমাজ কল্যাণ।
মনীশ: সংস্থা! মানে?
শমিক: সংস্থা মানে এন.জি.ও আর কি। সারা ভারত জুড়েই ওদের নেটওয়ার্ক। ওই এনজিও ওই সমস্ত রেডলাইট এলাকার মেয়েদের শিক্ষা এবং কাজের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আর এদেরই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা,দীক্ষা, অন্ন,বস্ত্র আর সংস্কৃতির জন্য কাজ করছে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের আর ওপথে যেতে না হয়।
মনীশ: তুই সত্যি বলছিস শমু? তুই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত? বাঃ বাঃ।
শমিক: তোমার কাছে মিথ্যা বলব, তুমি ভাবলে কি করে বাবা?
মনীশ: যাক, এতক্ষণে আমার বুকের ভারী পাথরটা নেমে গেল। গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। হ্যাঁ রে, তোর মাকে জানাবি না?
শমিক: ভাবছি। তোমাকে জানালাম, কিন্তু মা কে জানালে, মা কেমন ভাবে নেবে। মার মুডের তো কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

মনীশ: কিন্তু আমাদের বৌমা যে মত দিয়েছে, এটা বড় ভালো কথা। খুব উদার ওর মন।

শমিক: ওরই তো সব থেকে বেশি উৎসাহ বাবা। বলে, ওদের বড় কষ্ট। কত দুঃখে ওদের ওপথে যেতে হয়। যদি তোমরা ওদের জন্য কিছু করতে পারো। (সুমিতা প্রবেশ করে। হাতে শমিকের বেরোবার ব্যাগ। শমিক ব্যাগটা নেয়।) আমি আসি বাবা। (অন্য ঘরের উদ্দেশ্যে) আমি আসছি মা।

(নেপথ্যে মনরমা দুর্গা দুর্গা বলে। শমিক বেরিয়ে যায়।)

মনীশ: বৌমা, তুমি জানো যে শমিক (ইতস্তত)

সুমিতা: হ্যাঁ বাবা, জানি। ঐ সব অভাগা মেয়েদের জন্য আপনার ছেলে এত কিছু করার চেষ্টা করছে, আমার কি বাধা দেওয়া উচিত? যে কোনো ভালো কাজে আমি আপনার ছেলের পাশে থাকব।

মনীশ: ঠিক বলেছ। তুমি বাধা দিও না। দেখবে এতে ওর, তোমার আমাদের সকলের মঙ্গল হবে।(প্রস্থান)

সুমিতা: মঙ্গল! হ্যাঁ আমার তো মঙ্গল হয়েছে। কিন্তু আমি, আমি এ বাড়ির মঙ্গল করছি তো! আমি তো আমার সব কথা এখনো এ বাড়ির কাউকে, এমনকি শমিককে পর্যন্ত বলতে পারিনি। আচ্ছা, ও যদি আমার সব কথা কখনো শুনতে পায়, আমাকে মেনে নেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, নেবে না কেন? কত মহৎ হৃদয় ওর। কিন্তু যদি মেনে না নেয়? তখন? কোথায় যাব আমি? কার সামনে গিয়ে দাঁড়াব? না না, এই সুখ, এ ভালোবাসা ছেড়ে কোথাও আমি যেতে পারব না। হে ভগবান, এ সুখ, ভালোবাসা থেকে আমায় বঞ্চিত করো না, করো না। (কান্না। নেপথ্যে সুমিতার গলা শোনা যায়)

নেপথ্যে: সুমিতা—

সুমিতা: কে?

নেপথ্যে: কি ভাবছ?

সুমিতা: কই, কিছু না তো।

নেপথ্যে: ভাবছো, ভাবছো। ভাবছো জীবনকে বাজি রেখে সুখ আর ভালবাসা চুরি করবে?

সুমিতা: না না, চুরি করবো কেন? এ তো আমার পাওনা, আমার স্বামীর ঘরের অধিকার।

নেপথ্যে: তুমি ভুল করছ। এ সুখ মরীচিকা, এ ভালোবাসা বিভ্রম। এ কখনো স্থায়ী হবে না, হতে পারে না। একদিন না একদিন তোমার অতীত সবাই জেনে যাবে। সেদিনটা কিন্তু তুমি, তোমার সংসার, সকলের পক্ষে ভয়ঙ্কর।

সুমিতা: তা হলে আমি কি করব?

নেপথ্যে: এখনো সময় আছে। সব ছেড়ে, যেখানে তুমি ছিলে, সেখানে চলে যাও। পালাও সুমিতা পালাও। এ সুখ তোমার হতে পারে না। পালাও।

সুমিতা: পালাবো! না, এ আমি পারবো না। কিছুতেই না। এই ভালোবাসার স্বর্গ ছেড়ে আমি চলে যেতে পারব না। (কান্নায় ভেঙে পড়ে। আলো স্বাভাবিক হয়। নেপথ্যে বিভাসের গলা শোনা যায়।)

বিভাস: শমিক, শমিক বাড়ি আছিস?

সুমিতা: কে? ও বিভাস বাবু। আসুন। (বিভাস প্রবেশ করে।)

বিভাস: কি ব্যাপার বৌদি? আপনাকে ও রকম লাগছে কেন? মনে হচ্ছে চোখে জল? কাঁদছিলেন?

সুমিতা: কই, না তো। (লুকিয়ে জল মুছে)

বিভাস: নিশ্চয়ই কিছু। না বললে হবে? কি? শমিকের সঙ্গে মান-অভিমান? নিশ্চয়ই গড়িয়াহাটে একটা খুব ভালো শাড়ি ডিসপ্লে করে রাখা আছে? আপনার খুব পছন্দ। কিন্তু বেরসিক শমিক বলছে সামনের মাসে। তাই তো? তাই চোখে জল।

সুমিতা: সে রকম কিছু না। না চাইতেই আমি সব পেয়ে গেছি। আপনি বসুন। আমি চা করে আনি।

বিভাস: চা, আবার? এইমাত্র খেয়ে বেরোলাম। তাও দিন। কথায় আছে না, স্মোকিং ইস ইনজুরিয়াস টু হেলথ, বাট টি টাইম ইজ এনি টাইম। কিন্তু তিনি কোথায়, মিস্টার শমিক বাবু?

সুমিতা: ও একটু বেরিয়েছে।

বিভাস: এই আস্ত একটা ছুটির দিনেও?

সুমিতা: হ্যাঁ, কি একটা কাজ আছে বলল।

বিভাস: একটা কথা বলি ম্যাডাম, উপদেশ। ছাড়া পাখি একবার বাঁধা পড়লে আর ছাড়তে নেই। খাঁচায় ফিরে না এসে সে অন্য গাছের ডালে গিয়ে বসতে পারে।

সুমিতা: আপনার বন্ধুকে আমি চিনি জানি। আর তাছাড়া

তার ডানায় একটা চুম্বক লাগিয়ে দিয়েছি। খাঁচার টানে ঠিক ফিরে আসবে।

বিভাস: তাই নাকি? এত কনফিডেন্স। ভালো ভালো।

সুমিতা: আপনি বসুন, আমি চা আনি। আর বাবাকে গিয়ে বলি যে তার দাবার পার্টনার এসে গেছে। (মনীশের প্রবেশ)

মনীশ: আর ডাকতে হবে না, আমি এসে গেছি। জানো বিভাস, ছেলের বন্ধু, বাবার দাবা খেলার পার্টনার। এ নাকি এক আশ্চর্য কম্বিনেশন। সবাই বলে আর কি।

বিভাস: আমি তো রোজই হারি। আসলে আমি শিখতে আসি। (টি টেবিলের নিচে আগে থেকেই রাখা একটা দাবার বোর্ড নিয়ে সাজাতে থাকে) না খেললে কি আর শেখা যায়?

সুমিতা: বাবা, আমি যাচ্ছি। তবে খেলতে বসে সব কিছু আজও যেন ভুলে যাবেন না। সকাল সকাল চান খাওয়া করে একটু ঘুমাবেন। (প্রস্থান)

মনীশ: (দাবার চাল দিতে দিতে) দেখেছ বিভাস, কি শাসন! সত্যিই আমরা এখন বড় নিশ্চিন্ত। এমন বৌমা কজন পায়?

বিভাস: হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। তবে আমি কিন্তু শমিকের ব্যাপারটা একদম মেনে নিতে পারছি না মেসোমশাই।

মনীশ: কোন ব্যাপারটা?

বিভাস: ঐ যে, সেদিন বললাম না, শমিক, সেই যে, ঐ পাড়ায় যাতায়াত করছে।

মনীশ: হ্যাঁ, বলেছ, কিন্তু পুরোটা বলোনি।

বিভাস: মানে?

মনীশ: মানে, শমু কি উদ্দেশ্যে ওখানে যায়, সে কথাটা বলনি।

বিভাস: না, তা বলিনি। (একটু থেমে) তবে না গিয়েও তো কাজ করা যায়। এতে বদনাম বাড়ে না? বলুন! তাছাড়া একটা প্রলোভন তো বটেই, তাই কি না?

মনীশ: পাঁকে না নামলে কি পাঁক পরিষ্কার করা যায় বিভাস? শমু পাঁক ঘেটে মুক্ত-ঝিনুক তুলে আনছে। আমি কি সেই কাজে বাধা দিতে পারি?

বিভাস: হ্যাঁ সব মানছি। তবুও, আর পাঁচটা লোক, তারা তো আর এত কিছু জানবে না। যাই বলুন, শমিকের মতন ছেলের ওই খারাপ পাড়ায় যাতায়াত আর ওই সব মেয়েদের নিয়ে মাতামাতি একদম মানায় না।

মনীশ: ও যা করছে ভাল বুঝেই করছে। যাক গে, তুমি কিন্তু এইসব কথা আবার তোমার মাসিমাকে বোলো না। তিনি জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না।

বিভাস: না না, কি যে বলেন। কিন্তু আপনি যে আজ একেবারে কিস্তিমাত হয়ে গেলেন মেসোমশাই।

মনীশ: অ্যাঁ, হ্যাঁ তাইতো! আর যে পালাবার পথ নেই মনে হচ্ছে। (মনোরমার প্রবেশ)

মনো: কার পালাবার পথ নেই বিভাস? তোমার, না তোমার মেসোমশাইয়ের?

বিভাস: মেশোমশাইয়ের কিস্তিমাত মাসিমা। আজ বুঝে গেছি, কোন পথে মেসোমশাইকে মাত করা যায়।

মনীশ: আমিও ছাড়ছি না বিভাস। তুমি আর একবার সাজাও। আমি একটুখানি আসছি। (ইশারায় টয়লেট বুঝিয়ে প্রস্থান)

মনো: কি হলো বিভাস, সাজাও।

বিভাস: না মাসিমা, আজ আর ভালো লাগছে না। আজ আমি বাড়ি যাই।

মনো: বাড়ি যাবে, এত তাড়াতাড়ি? বৌমা চা আনছে। আর শমু তো এখনি এসে পড়বে। দেখা করে যাবে না?

বিভাস: শমিক? ও বোধহয় এত তাড়াতাড়ি আসবে না মাসীমা।

মনো: কেন? তুমি জানো ও কোথায় গেছে?

বিভাস: জানি। আসলে আপনাকে বলতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু শমিকের ভালোর জন্য একথাটা না বললেও আমি শান্তি পাবো না।

মনো: কি কথা বিভাস? তুমি নিঃসংকোচে বল।

বিভাস: মাসিমা, শমিককে আমি অনেক করে বুঝিয়েছি। কিন্তু ও আমার কোন কথা শুনছে না।

মনো: শমিক! কী করেছে সে?

বিভাস: শমিক প্রায়ই ঐ সব খারাপ পাড়ায় যাতায়াত করছে।

মনো: খারাপ পাড়ায়! মানে?

বিভাস: মাসিমা, শমিক নাকি, কি একটা জন-কল্যাণ সংস্থার হয়ে কাজ করছে। ওই সংস্থা যত নিষিদ্ধ পাড়ায় মেয়েদের মানে যৌনকর্মীদের কাজের স্বীকৃতি আদায়ের

জন্য খাটছে। আর সেই জন্য শমিক প্রায়-ই ঐ সব খারাপ পাড়ায় যাতায়াত করছে।

মনো: বিভাস!

বিভাস: সরি মাসীমা, কথাটা আপনাকে বলা ঠিক হল কিনা জানি না। এই কথাটা আমি আপনাকে বলেছি, মেসোমশাইকে বলবেন না প্লিজ। আসলে মেসোমশাইকে বলার পরও তিনি যখন ব্যাপারটা গুরুত্ব দিলেন না, তখন বাধ্য হয়ে আপনাকে বলতে হল।

মনো: কি বললে? তোমার মেসোমশাই জানেন?

বিভাস: হ্যাঁ মাসিমা। এমন কি আপনার বৌমা মানে সুমিতা বৌদিও সবকিছু জেনেও শমিককে কোনরকম বাধা দিচ্ছে না এ কাজে।

মনো: সে কি! বৌমা, বৌমা—

বিভাস: আজ আমি যাই মাসীমা। বাজারটা করে বাড়ি ফিরতে হবে। পরে একদিন আসব। চলি। (বিভাসের দ্রুত প্রস্থান। ওই সময়ে মনীশ বাবুও প্রবেশ করেন। তিনি বিভাসের চলে যাওয়া দেখে বুঝতে পারেন কি ঘটেছে।)

মনো: হ্যাঁ গো, এসব কি শুনছি?

মনীশ: কি শুনছো?

মনো: শমু নাকি ওইসব নোংরা পাড়ায় যাতায়াত করে? আর তুমি সব জেনেও কিছু বলনি?

মনীশ: কে বললো তোমায়? বিভাস বুঝি? তুমি শমিককে ভুল বুঝো না। ও এমন কোন কাজ করতে পারে না, যাতে আমাদের মাথা নিচু হয়।

মনো: এর পরেও তুমি একথা বলতে পারছ?

মনীশ: হ্যাঁ পারছি। কারণ শমিক যা করছে তাতে বরং আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে। তুমি জানো, ওইসব মেয়েদের ভালোর জন্য লড়াই করছে আমাদের শমিক। তাদের সন্তানরা যাতে লেখা-পড়া, গান-বাজনা সংস্কৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের একজন হয়ে উঠতে পারে, তার-ই জন্য কাজ করছে ও?

মনো: ওইসব কথাবার্তা রাজনৈতিক মঞ্চে গিয়ে বোলো, মানাবে। হাততালিও পাবে। সমাজ সংসারে নয়। কারন কথা রাখার দায়বদ্ধতা রাজনীতিতে থাকেনা, সংসারে থাকে। যাও না ওইসব গ্রামে, যেখানে অনাহারে থেকে থেকে মানুষ মরছে। ছেলে মেয়েকে খেতে দিতে না পেরে বাবা-মায়েরা আত্মহত্যা করছে। নূন্যতম শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত। যাও না ঐ চাষির বউটার কাছে, যার স্বামী দেনার দায়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। তা না, ওইসব প্রলভন সর্বস্ব নরকের দরজায়! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

মনীশ: মনোরমা শোনো।

মনো: না, আমি কোন কথা শুনবো না। বৌমা কোথায়? বৌমা বৌমা।

মনীশ: মনোরমা, আমাদের শমিক কোন বাজে কাজ করেনি, করতে পারে না। ওইসব সমাজমূলক কাজে যুক্ত থাকলে ওর নাম যশ একদিন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। খবরের কাগজ, টিভিতে ওর নাম বলবে। তুমি দেখো।

মনো: ও! তাহলে সমাজ কল্যাণ ওর আসল উদ্দেশ্য নয়। নাম যশ পাবার জন্য একটা উপলক্ষ মাত্র। তাই বলো।

মনীশ: না। ঠিক তাও নয়। উঃ কি করে যে তোমায় বোঝাই।

মনো: আমাকে তোমার কিচ্ছু বোঝাতে হবে না। তুমি চুপ করো। এবার যা বোঝাবার আমি বোঝাবো। বৌমা, বৌমা (চায়ের কাপ হাতে সুমিতা প্রবেশ করে) এই যে বৌমা, শমিক কোথায় গেছে? চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও। শমিক কোথায়? (সুমিতা নিরুত্তর) ছিঃ বৌমা ছিঃ। তুমি না ওর স্ত্রী! ওর ভালো মন্দ সব তুমি জড়িয়ে আছো?

মনীশ: আঃ বৌমাকে তুমি বকছো কেন? ও কি করবে? (ইতিমধ্যে শমিক প্রবেশ করে)

শমিক: কি হয়েছে? এত চেঁচামেচি কেন?

মনো: শমিক, আজ রবিবার, ছুটির দিন। তুই কোথায় গিয়েছিলি?

শমিক: একটা মিটিং ছিল।

মনো: মিটিং? কোথায়?

শমিক: এই তো কাছেই। নবারুণ সংঘে। কেন?

মনো: ছিঃ শমু ছিঃ, তুই আজ এই জায়গায় পৌঁছেছিস? আমার সঙ্গেও মিথ্যে কথা বলছিস? তোর লজ্জা করে না, তুই ওই সব পাড়ায় যাতায়াত করিস? পাড়ায় আমি মুখ দেখাবো কেমন করে?

শমিক: (মনীশকে) মা সব জেনে গেছে?

মনীশ: মনোরোমা, আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা কর।
শমিক: এতে আমার ভালো হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী আসবেন এখানে। এর ফলে হয়তো আরও ভালো একটা চাকরি কিংবা প্রমোশন পেয়ে যেতে পারি। নিদেন পক্ষে একটা রাজনৈতিক বেসও তৈরি হয়ে যেতে পারে, বল।
মনো: কী? ওইসব মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়ে তুই নিজের আখের গোছাতে চাইছিস? ছিঃ শমু ছিঃ, তুই এতটা নিচে নেমে যাবে আমি ভাবতেও পারিনি।
শমিক: ওঃ মা, সব কথার উল্টো অর্থ কোরো না তো।
মনো: শোন শমিক, আমি খুব স্পষ্ট করে বলছি, তুই যদি তোর ওই সব জনকল্যাণ কাজ নিয়ে থাকতে চাস তো থাকতে পারিস। সেটা তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুই এখন অনেক বড় হয়ে গেছিস। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। তাই তুই তোর বউকে নিয়ে অন্য জায়গায় থাকতে চাস তো থাকতে পারিস। আমি বাধা দেব না।
সুমিতা: মা, আপনি কি বলছেন?
মনো: শোনো বৌমা, এটাই আমার শেষ কথা। এ সব আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবোনা। (প্রস্থান)
শমিক: বাবা, এবার আমি কি করব?
মনীশ: তোর মাকে তো চিনিস শমু। একবার যখন না করেছে, তখন তাকে হ্যাঁ করানোর সাধ্যি আমার নেই।
শমিক: তুমি এই কথা বলছ বাবা?
মনীশ: আমি তো তোর কোনো কাজে কোনদিন বাধা দেইনি শমু। তবে এটা যখন তোর মা চাইছে না, তুই বরং কাজটা ছেড়েই দে। (প্রস্থান)
শমিক: মা বাবা আমাকে চরম ভুল বুঝল। আমার কিছু করার নেই। কিন্তু সুমিতা, তুমি কোন কথা বলছো না যে? কি ভাবছো বলতো?
সুমিতা: অ্যাঁ, না কিছু না। আচ্ছা শমিক, মা যা বলে গেলেন, তা সত্যি? সত্যি সত্যি তুমি ওইসব চির-দুঃখী মেয়েগুলোর ভালোর জন্য যা করছ, আসলে তা করছ নিজের স্বার্থের জন্য?
শমিক: আরে না না। হঠাৎ মার কাছে সব ফাঁস হয়ে গেছে তো, মার জেরার মুখে পড়ে ঐ রকম বলে ফেলেছি। এরকম একপেশে চিন্তা নিয়ে কেউ এত বড় কাজে হাত দেয় না। যাক গে, তুমি ওইসব ভেবে মন খারাপ করো না তো! শিগগিরি যৌন কর্মী সম্মেলন হবে। তোমাকে নিয়ে যাব। দেখবে কি বিরাট কর্মকাণ্ড।
সুমিতা:(চমকে উঠে চিৎকার করে) না।
শমিক: ও কি! চেঁচিয়ে উঠলে কেন? মুখখানা যে সাদা হয়ে গেছে! আচ্ছা বাবা, তোমার আপত্তি থাকলে যেতে হবে না। তুমি যাও তো, বেশ কড়া করে এক কাপ চা নিয়ে এস। বাব্বাঃ যা ধকল গেল আজ। আরে এই চা টা কার?
সুমিতা: চা? ও হ্যাঁ, বিভাস বাবুর জন্য এনেছিলাম। কিন্তু উনি চা না খেয়েই চলে গেছেন।
শমিক: কে? বিভাস এসেছিল? হুম, এতক্ষনে বুঝলাম ব্যাপারটা। আগুনটা তাহলে ওই দিয়ে গেছে। রাস্কেল একটা।
সুমিতা: দাঁড়াও চা নিয়ে আসি।
শমিক: দরকার নেই। ওটা এখনো গরম আছে। (শমিক চা খেতে থাকে। সুমিতা পাশে এসে বসে।)
সুমিতা: শমিক, আমার না ভীষণ ভয় করছে।
শমিক: ভয়? কেন? আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস নেই?
সুমিতা: না না, তা নয়। বাবা যদিও ব্যাপারটা হালকাভাবে নিয়েছেন। কিন্তু মা? মা আমাদের বলছেন ওদের ছেড়ে চলে যেতে। কিন্তু তা তো হওয়া উচিত নয়, বলো। তুমি বরং কাজটা ছেড়েই দাও।
শমিক: না, তা হয় না সুমিতা। মা অবুঝ হচ্ছে দেখে একটা ভাল কাজ, এত খানি এগিয়েও ছেড়ে দেবো? ওখানকার আর সকলে কি বলবে? তুমি এভাবে বোলো না।
সুমিতা: কিন্তু আমার যে ভীষণ ভয় করছে।
শমিক: ধুর পাগলি, ভয় কি? ও, মাকে আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব। আরে বাবা, মাকে তো চেনো। যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। কালকের মধ্যেই সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। তোমাকে বিয়ে করব, যখন প্রথম জানালাম তখন, ওঃ যা একখানা টর্নেডো হয়ে গেছিল না! তারপর সব ঠিক হয়ে গেছে।
সুমিতা: (একটা গভীর শ্বাস ফেলে) হ্যাঁ সবই ঠিক হয়ে গেছে।

শমিক: নাও, নাও, আর মন খারাপ করো না তো। তার চেয়ে চলো একদিন আমাদের এনজিও অফিসে। দেখবে কত বড় বড় লোক এর সঙ্গে যুক্ত।

সুমিতা: কিন্তু শমিক—

শমিক: তুমি জানো না, লাস্ট উইকে কে এসেছিলো।

সুমিতা: কে?

শমিক: সমাজ কল্যাণ দপ্তর এর মুখ্য সচিব, ডঃ নিরঞ্জন রায় সস্ত্রীক এসেছিলেন। প্রায় সবাই তাদের বউদের পরিচয় করালো। শুধু আমি বাদে। ওইখানে সবাই তোমাকে দেখতে চায়, পরিচয় করতে চায়। প্লিজ সুমি, একটিবার অন্তত চলো।

সুমিতা: না।

শমিক: কি না?

সুমিতা: আমি যাব না।

শমিক: আমি এত করে বলছি তার কোন দাম নেই তোমার কাছে?

সুমিতা: আছে, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমি ওখানে যেতে পারব না। ওসব ভীড়, হট্টগোল আমার ভালো লাগে না।

শমিক: কোন ভিড় নেই ওখানে। সবাই দরকারি লোক। আর তাছাড়া তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, হাসিখুশি, স্মার্ট, মিশুকে—

সুমিতা: শমিক, আমি জীবনে এত দুঃখ, এত কষ্ট পেয়েছি, এত অনিশ্চিত জীবন কাটিয়েছি যে, তোমাকে পাওয়া এই সংসারকে পাওয়া, এই সুখ, সব কেমন যেন অলীক স্বপ্ন বলে মনে হয়। আমার মন শুধু বলে হারাই, হারাই। আমি কোথাও যাবো না শমিক। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

শমিক: দাঁড়াও সুমিতা, যেও না। ঠিক করে বলতো, এসব কথার মানে কি?

সুমিতা: আচ্ছা শমিক, তোমার মা তো আমার বংশ মর্যাদা, আমার আত্মীয়-স্বজন, এসব বিষয়ে খোঁজখবর করেন। কই তুমি তো করো না?

শমিক: তোমার আত্মীয়দের নিয়ে আমি কি করব? তাছাড়া আমি তো জানি তোমার বাবা মা কেউ নেই, তুমিই তো বলেছ।

সুমিতা: আর কিছু?

শমিক: আর কিছু?

সুমিতা: আমার অতীত, তোমার সাথে দেখা হওয়ার আগের আমি? আমিতো বহুবার বহুভাবে তোমাকে বলতে চেয়েছি। তুমি তো শুনতে চাওনি?

শমিক: না, আমার কোন কথা শুনে লাভ নেই। আমি তোমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি, ব্যাস। আর কিছু আমি জানতে চাই না।

সুমিতা: আচ্ছা শমিক, তুমি তো ওই বেশ্যা পাড়ার মেয়েদের জন্য কত ভাবছো, কত কিছু করার চেষ্টা করছে ওদের জন্য। ধরো, তুমি যদি কোনদিন শুনতে পাও যে, তোমার কোন নিকট আত্মীয়, অবস্থা গতিকে কোন উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে। তুমি কি করবে?

শমিক: ছিঃ ছিঃ সুমিতা। এসব তুমি কি বলছো পাগলের মত? কোন ভদ্র ঘরের মেয়েরা কোন অবস্থাতেই ও পথে যায় না। ও সব আলাদা ধাঁচের মেয়ে। আমার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ওদের তুলনা করে তুমি আমাদের বংশমর্যাদাকে অপমান কোরো না। সমাজের আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করব বলে, ঘরে আস্তাকুঁড় বানাবো? এরকম ভাবার কোন কারণ নেই।

সুমিতা: ওঃ তাই? (কলিংবেল বাজে)

শমিক: দেখতো কে এলো?

সুমিতা: তুমি দেখ।

শমিক ওঃ আর পারা যায় না। (শমিক দরজা খোলে। অলক প্রবেশ করে) ওঃ অলক তুই? এই দেখো সুমিতা, কে এসেছে? আমার সেই ছোট্ট বেলার বন্ধু অলকের কথা বলতাম না? দুই দেহে এক প্রাণ, এই সেই অলক।

সুমিতা: (চমকে উঠে ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায়) আপনি বসুন, আমি চা নিয়ে আসি। (দ্রুত প্রস্থান)

শমিক: (একটু অবাক) তারপর, কি মিস্টার অলক সান্যাল। এতদিন ছিলেন কোথায়? আরে বোস! (অলক বসে)

অলক: আর বলিস কেন। হঠাৎ একটা বেশ বড় প্রমোশন দিয়ে, কোম্পানি ট্রান্সফার করে সোজা মুম্বাই পাঠিয়ে দিল। ওই ব্রাঞ্চের পুরো দায়িত্বই আমার। তোর বিয়ের সময়ও আসতে পারলাম না। তারপর দীর্ঘদিন পরে এই ছুটি মিলল, তাও আবার মাত্র সাত দিনের জন্য। ছুটে এলাম

তোর কাছে। এ ক'দিন নো কাজ, নো টেনশন, শুধু স্ফূর্তি আর মৌজ মস্তি। ও হ্যাঁ, ওখানে ছিলেন, ওঘরে গেলেন উনি কে?

শমিক: হু হু, কে বলতো?

অলক: কে আবার? নিশ্চয়ই তোর অর্ধ-অঙ্গ।

শমিক: হ্যাঁ রে ব্যাটা উল্লুক। ওই হল সুমিতা। দাঁড়া, চা আনুক, তোর সঙ্গে আলাপ করে দেব। তা তোর খবর কি? বিয়ে থা করেছিস ও দেশের কোন মায়াবিনি? নাকি আগের মতই...

অলক: বিয়ে! সংসার! হা হা, নারে বাবা! ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আমি নেই। এই ভালো আছি, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তোর বউকে যে টুকু দেখলাম খুব চেনা চেনা মনে হল। আমাদের ও দিককারের মেয়ে নাকি রে?

শমিক: না না, বাড়ি তো বালিগঞ্জ সাইডে, কসবায়।

অলক:(একটু চিন্তা করে) ওঃ তাই! সে যাক গে, মাসীমা মেসোমশাই কেমন আছেন?

শমিক: ভালো। মা, বাবা, দেখে যাও কে এসেছে। অলক তুই একটু বসে বাবা মায়ের সাথে গল্প কর। আমি দেখি চা কতদূর?

অলক: (হেসে) যা, ঠিক আছে।(মনীশ আর মনোরমার প্রবেশ)

মনীশ: আরে অলক! কখন এলে? বাঃ দারুণ ঝকঝকে চেহারা হয়েছে তো তোমার! তা এতদিন কোথায় ছিলে?

অলক: বোম্বে, মানে মুম্বাই। (নমস্কার করে)

মনো: থাক, থাক। তোমার মা কেমন আছেন?

অলক: ওই আর কি। ইদানিং বাতের ব্যথাটা একটু বেড়েছে।

মনীশ: আসলে বয়স হয়েছে তো। এ বয়সে ওরকম একটা না একটা বাঁধা অসুখ থাকবেই। এই দেখো না, আমার সুগার আর তোমার মাসীমার প্রেসার।

মনো: অলক, মা অসুস্থ। এবার একটা বিয়ে করে সংসারি হয়ে মাকে একটু শান্তি দাও। তুমিই বা একা একা কতদিন থাকবে?

অলক: বিয়ে! না মাসিমা ওসব নিয়ে এখনও কিছু ভাবছি না। আসলে আমি এসেছি এখানকার পাট গুটিয়ে পার্মানেন্টলি মাকে নিয়ে যেতে।

মনো: বেশ করেছ। এ বয়সে একা একা থাকা খুবই কষ্টের।

মনীশ: তা তুমি আগের কোম্পানি চেঞ্জ করে ওখানে গেলে, না কি ওই অফিসে আছো?

অলক: না মেসোমশাই, আগেরটাতেই আছি। তবে ট্রানস্ফার প্রমোশন দিয়েছে। গাড়ি, ফ্ল্যাট ইত্যাদি নানান ফ্যাসিলিটিজ মিলিয়ে বেশ ভালো সুযোগ দিয়েছে।

মনীশ: বাঃ বাঃ খুব ভালো কথা।

অলক: আচ্ছা মাসীমা, আপনার বউমা, আই মিন শমুর বউ কি—

মনো: আমরা ওর সম্পর্কে তেমন কিছুই বলতে পারব না অলক। শমু পছন্দ করে বিয়ে করেছে।

অলক: কিন্তু যোগাযোগটা হল কি করে?

মনীশ: অফিসে যাতায়াতের পথেই ওদের পরিচয়। ছয় মাসের মধ্যেই বিয়ে।

অলক: আই সি। কিন্তু আপনারা কোন খোঁজখবর নেননি?

মনীশ: আমরা কি করব বলো? শমু বড় হয়েছে। ওর ইচ্ছে -অনিচ্ছের দাম তো দিতে হবে। তোমার মাসিমা একটু রেগে গিয়েছিলেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের বউমা কিন্তু আমাদের মনের মতন হয়েছে। একদম লক্ষ্মী প্রতিমাটি। কি বল মনোরোমা?

(সুমিতাকে প্রায় জোর করে টানতে টানতে নিয়ে শমিক প্রবেশ করে। সুমিতার হাতে ট্রেতে চা, মিষ্টি)

শমিক: আরে এসো তো। কিচ্ছু হবে না। এই দেখ অলক, তোর ভাবিজি। আই মিন—

অলক: আর বলতে হবে না। যা বোঝার আমি বুঝে গেছি। এখন তোরই শুধু বোঝা বাকি। উনি তো এখনো আমার প্রতি বিমুখ।

শমিক: আরে, তাইতো। এই তুমি ওমন করে মুখ ফিরিয়ে আছো কেন? আরে ও তোমার কোন ভাসুর টাসুর নয়, ও আমার বন্ধু অলক। (সুমিতা তবু কাঠের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। শমিক তখন নিজেই ঘোমটা খুলে দেয়।) এই দেখ অলক, নতুন বউ কেমন লজ্জাবতী। (দেখা যায় দুজন, দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে। সুমিতা কাঠ। অলক মৃদু মৃদু হাসছে। সুমিতা টলতে-টলতে কিছু একটা অবলম্বন ধরে দাঁড়ায়)

অলক: আপনি—

সুমিতা: আমার খুব অসুস্থ লাগছে মাথা ঘুরছে। আমি আসছি। (প্রস্থান)

মনীশ: বউমার আবার কি হল? মনোরোমা দেখোতো।

মনো: হ্যাঁ, দেখছি। [প্রস্থান]

অলক: মাথা তো ঘুরবেই। তা না হলে আমি ঠিক ঘুরতে ঘুরতে এখানে হাজির হব কেন?

শমিক: মানে, কি বলতে চাইছিস তুই?

অলক: আছে বন্ধু রহস্য একটা। হ্যাঁ রে শমিক, তুই বিয়ে করেছিস কতদিন?

শমিক: এই তো, আট মাস হল কেন?

অলক: ওর বাবা-মা, আই মিন তোর শ্বশুর শাশুড়ি?

শমিক: সুমিতার কেউ নেই। ও প্রায় অনাথা। ওর কাকা ওকে মানুষ করেছে।

অলক: হুম, যা ভেবেছিলাম। আর কিছু?

শমিক: না। এর বেশি কিছু জানিনা। আসলে জানার প্রয়োজন বোধ করিনি কখনো। সুশ্রী, সুন্দর স্বভাব, মিষ্টিভাষী, স্মার্ট। মানে আমি যা যা চেয়েছিলাম, এক কথায় সুমিতা ঠিক তাই। কিন্তু তুই এভাবে কথা বলছিস কেন? তুই সুমিতাকে আগে চিনতিস?

অলক: শুধু আমি কেন, অনেকেই ওকে চিনতো।

শমিক: মানে?

মনীশ: বাবা অলক, তুমি এরকম হেঁয়ালি করে কথা বলো না। তুমি সত্যি করে বলো। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।

অলক: করবেন না মেসোমশাই, আমার বোধহয় এখানে আসাটা ঠিক হয়নি।

মনীশ: ঠিক হয়নি! কেন?

অলক: শমিক, যদিও তোর পারিবারিক ব্যাপারে আমার মাথা গলানোটা উচিত হবে না জানি, তবুও আমি তোর বন্ধু। তোর কোন ক্ষতি হোক, সেটা আমি তোর বন্ধু হিসেবে চাইব না। বোধ হয় কাজটা তোর ঠিক হয়নি। বিয়ের আগে ওর সম্পর্কে তোর সঠিকভাবে খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল।

শমিক: সঠিকভাবে খোঁজখবর! অলক প্লিজ, আমাকে হেঁয়ালির মধ্যে রাখিস না। যা জানিস আমাকে খুলে বল।

(অলক একপাশে সরে গিয়ে শমিককে কিছু বলতে থাকে। শমিক খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে)

শমিক: না, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনা।

অলক: বিশ্বাস না করে উপায় নেই শমিক। সত্যি কোনদিন চাপা থাকেনা।

মনীশ: কি হয়েছে অলক? শমু এমন করছে কেন? (মনোরমার প্রবেশ)

মনো: ওগো শুনছো, শিগগির একবার ও ঘরে চলো। বৌমা কেমন করছে।

অলক: করুক মাসীমা। পরে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। আপনি বরং শমিককে সামলান।

মনো: কেন, কি হয়েছে শমুর? শমু, কি হয়েছে তোর?

শমিক: ওকে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে বল মা, এক্ষুনি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মনীশ: বৌমা চলে যাবে? কেন? কোথায়?

অলক: আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু শমিকের মুখ চেয়ে আমাকে কথাটা বলতেই হবে মেসোমশাই। শমিকের বউ, মানে ওই মেয়েটা বিয়ের আগে একটা কলগার্ল ছিল, যাকে বলে প্রস্টিটিউট।

মনো: অলক! কি বললে তুমি?

মনীশ: সাবধান অলোক, তোমার লজ্জা করছে না? আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে, তুমি আমার বাড়ির বউ-এর নামে এসব কথা বলছ? কোন প্রমাণ আছে তোমার?

অলক: একটা কেন? হাজারটা প্রমাণ নিমেষে জোগাড় করা যাবে। পয়সার লোভে বহু মানুষের শরীরের খিদে মিটিয়েছে ও। বিশ্বাস না হয়, ওকেই একবার ডাকুন না আমার সামনে। শ্রীমতি নিজেই তো এ মামলার বড় সাক্ষী।

মনো: ওঃ চুপ কর অলক, আর সর্বনাশ বাড়িও না। তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। চা খেয়ে এখান থেকে চলে যাও।

অলক: সরি মাসীমা, ওর হাতের চা খাওয়ার মতন প্রবৃত্তি আমার হবে না। (প্রস্তনোদ্যত। এমন সময় উদ্‌ভ্রান্তের মতো সুমিতা প্রবেশ করে)

সুমিতা: তা হবে কেন মি: অলক সান্যাল? নিজের আখের

গোছাতে হোটেলে নিয়ে গিয়ে বড় কোম্পানির কন্ট্রাক্ট বাগাতে আমাকে দিয়ে কোম্পানির বড়সাহেবের মনোরঞ্জন করাতে, আমার হাত থেকে গ্লাসের পর গ্লাস মদ খেতে আপনার অরুচি হয়নি? এখন চা খেতে অরুচি হয়ে গেল?

শমিক: ইউ শাট আপ। (চড় মারে) আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুকে এসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? (এটা দেখে একটুখানি হেসে অলক চলে যায়)

সুমিতা: আমি চিট?

শমিক: হ্যাঁ চিট। তুমি আমায় ঠকিয়েছ।

সুমিতা: না, আমি তোমায় কক্ষনো ঠকাইনি।

শমিক: হ্যাঁ ঠকিয়েছো। তুমি তোমার কথা আমার কাছে গোপন করেছ।

সুমিতা: না আমি গোপন করতে চাইনি। তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর আমি অনেকবার তোমাকে আমার কথা বলতে চেয়েছি। তুমি কিছুতেই শুনতে চাওনি। বলেছ, আমি কিছু জানতে চাই না তোমার কথা। তুমি আছ, এটাই সত্যি আমার কাছে।

শমিক: তাই বলে এই তোমার পরিচয়? তুমি ঠগ, তুমি প্রবঞ্চক। তুমি চলে যাও। এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও।

সুমিতা: চলে যাব! কোথায় যাব? আমার তো কোথাও যাবার জায়গা নেই। আমার সামনেই হাঁ করে আছে কুৎসিত ভবিষ্যৎ। তুমি যদি আমাকে আশ্রয় না দাও, আমি যে তলিয়ে যাব। (পা জড়িয়ে ধরে)

শমিক: ছুঁয়ো না আমাকে। ওঃ, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। যেখানে খুশি তুমি চলে যাও, চলে যাও।

সুমিতা: (মনীশ বাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে) বাবা আপনি কিছু বলুন। আপনার ছেলে তো আমার মতন মেয়েদের জন্য অনেক কিছু করছে। না হলে যে আমাকে আবার ওই পথে যেতে হবে। ওই জঘন্য নরকের পচে মরতে হবে।

মনীশ: আমি জানিনা। কিচ্ছু জানি না। ওঃ ভগবান, আমাদের কপালে এই লেখা ছিল? তুমি কি করে আমাদের সঙ্গে এই ব্যবহার করলে? আমি যে তোমাকে মা বলে ডেকে ছিলাম।

সুমিতা: আমাকে তাড়াবেন না বাবা। আচ্ছা ঠিক আছে আমি না হয় ওই কোণের পড়ে থাকা ঘরটায় একা একা থাকব। কথা দিচ্ছি একবারের জন্যেও বাড়ির বাইরে বেরোবো না।

মনীশ: ডেকো না। আমাকে বাবা বলে ডেকো না। আজ যদি আমরা তোমাকে মেনে নি, কাল? কাল তো সবাই জানবে তোমার আসল পরিচয়। তখন আমরা সমাজে মুখ দেখাব কেমন করে? তুমি চলে যাও। যেখানে খুশি চলে যাও। আমরা বরং মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাব তোমায়।

সুমিতা: টাকা!

মনীশ: হ্যাঁ, টাকা। না হয় বল, কত টাকা দরকার, আমি এখনই দিচ্ছি। বলো।

সুমিতা: বাঃ ভদ্র সমাজের ভদ্র শিক্ষিত জন, বাঃ। এই আপনাদের অধ্যাপকের গর্ব? এই আপনাদের শিক্ষার অহংকার? এখন আমাকে টাকা দিতে চাইছেন? আপনারা জনসভার মঞ্চে ভাল ভাল বক্তৃতা দিতে পারেন। যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন আর কাজের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য গলা ফাটাতে পারেন। তাদের সঙ্গে সেলফি তুলে নিজেকে প্রচারে রাখতে পারেন। আর নিজের ঘরে এদের স্বীকৃতি দিতে বললে, মুখ লুকিয়ে পালিয়ে যেতে পারেন। সত্যিই তো, এই ভদ্র সমাজে আপনারা মুখ দেখাবেন কি করে?

(কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সকলে নির্বাক। সুমিতা উঠে দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।)

মনো: দাঁড়াও। কোথায় যাচ্ছ?

সুমিতা: জানিনা। আমার কোন ঠিকানা নেই।

মনো: আমার একটা কথার শুধু জবাব দিয়ে যাও।

সুমিতা: বলুন মা। না, আমার মুখে মা ডাক মানায় না।

মনো: তুমি এই পথে গিয়েছিলে কেন?

সুমিতা: কি হবে শুনে? তবে কয়েকদিনের জন্য হলেও আপনাকে মা বলে ডাকার সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন নিশ্চয়ই বলব। আমি হলাম অনাথা। আমার বাবা-মা কেউ নেই। আমি যাকে কাকা বলে ডাকতাম, তিনি আসলে আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছেন।

মনো: তুমি অনাথা?

সুমিতা: হ্যাঁ। একদিন এক ঝড় জলের রাত্রে একটা ডাস্টবিনের ধার থেকে আমার রিকশাচালক কাকা আমাকে তুলে নিয়েছিলেন তার কোলের মধ্যে। আর নামান নি।

তার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি মায়ের আদর, বাবার ভালোবাসা। পাছে আমাকে কষ্ট দেয়, তাই বিয়ে পর্যন্ত করলেন না। শত অভাবের মধ্যেও তিনি আমাকে লেখাপড়া শেখালেন, গান শেখালেন। ভালই কাটছিল। তারপর যেবার আমি বিএ পরীক্ষা দিলাম, কাকার অসুখ করল। কঠিন অসুখ। ক্যান্সার। চোখের সামনেই দিন দিন ওষুধ পথ্য, খাবার না পেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে কাকা মরতে লাগল। আমি পাগলের মতো হয়ে উঠলাম একটা কাজের জন্য।

মনো: তারপর?

সুমিতা: তারপর অনেক ঘুরে, অনেক কষ্টে একটা চাকরি পেলাম। মোটামুটি বেশ ভাল নামি কোম্পানির রিসেপ্সনিষ্ট-এর কাজ। মাইনেটাও ভদ্রস্থ। কাকার চিকিৎসা, সংসার মোটামুটি চলছিল। তারপর হঠাৎ একদিন মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। ডাক্তারবাবু বললেন, কাকাকে একটা অপারেশন আর কেমোথেরাপি দিতে হবে। খরচ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। কোথায় পাবো এত টাকা? ভাবলাম মাইনে থেকে এডভান্স নেব। দরখাস্ত করার পর, একদিন আমার বস আমাকে ডেকে পাঠালেন।

(আলো ছোট হয়ে এসে একটা চেয়ারে পড়ে। সেখানে বস, মানে অলক বসে আছে। একজন বেয়ারা প্রবেশ করে)

বেয়া: (অলকের সামনে থাকা ফাইল নিতে নিতে) স্যার, বাড়ি যাবেন না?

অলক: উম, হ্যাঁ। যাব।

বেয়ারা: রাত হয়ে গেল যে!

অলক: কটা বাজে রে?

বেয়ারা: প্রায় সাড়ে সাতটা।

অলক: শোন, বাইরে কেউ অপেক্ষা করছে?

বেয়ারা: হ্যাঁ। সুমিতা দিদিমণি। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। ডেকে দেবো?

অলক: হ্যাঁ, ডেকে দে তো এবার।

বেয়ারা: হ্যাঁ, দিচ্ছি। (প্রস্থান। সুমিতা প্রবেশ করে)

সুমিতা: আসতে পারি স্যার?

অলক: ও হ্যাঁ আসুন। বসুন। দেরি করানোর জন্য দুঃখিত।

সুমিতা: না, ঠিক আছে।

অলক: আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা পেয়েছি মিস সুমিতা। আপনার যেন কত প্রয়োজন?

সুমিতা: দুই লাখ।

অলক: আই অ্যাম সরি মিস সুমিতা। টাকাটা স্যাংশন করানো যায়নি।

সুমিতা: কিন্তু স্যার, টাকাটা না পেলে আমি—

অলক: আই ফিল, আই ফিল সুমিতা। আমি জানি আপনার টাকাটা খুবই দরকার। কিন্তু কি করব বলুন? আপনার চাকরিটা এখনও কনফার্ম হয়নি বলে এক্সিকিউটিভ বোর্ড এটা ডিনাই করেছে। (সুমিতা মাথা নিচু করে বসে আছে) বাট, কোম্পানি একটা অফার আপনাকে দিতে পারে, অবশ্য ইফ ইউ এগ্রী।

সুমিতা: অফার!

অলক: হ্যাঁ, কোম্পানির সামনে আজ একটা বড় চান্স এসেছে। আর সেই চান্সটা যদি আপনি কোম্পানিকে ধরিয়ে দিতে পারেন, তবে আমাদের কাউকেই আর ভাবতে হবে না।

সুমিতা: আমি!

অলক: হ্যাঁ মিস রায়। ইউ কে-এর একটা নামী কোম্পানির একটা বড় মাপের প্রপোজাল আমাদের কাছে এসেছে, যেটার আর্থিক অংকের পরিমাণ বেশ কয়েক কোটি টাকা।

সুমিতা: কিন্তু, আমি কিভাবে—

অলক: বলছি। ওই কোম্পানির ওয়ান অফ দা ডিরেক্টরস আগামী সোমবার ইন্ডিয়ায় আসছেন। উঠবেন গ্রান্ড-এ। এখানকার অন্যান্য কোম্পানিগুলির ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই, যে করেই হোক আমাদের ওই অর্ডারটা তুলে আনতে হবে। আপনি সুন্দরী, বুদ্ধিমতী। আপনাকে নিশ্চয়ই আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সুমিতা: অলক বাবু!

অলক: কোন কিন্তু নেই মিস রায়। অবশ্য এর জন্য কোম্পানী আপনাকে বোনাস হিসাবে বেশ কিছু টাকা দেবে, সঙ্গে প্রমোশন।

সুমিতা: না, এ আমি পারব না।

অলক: ভালো করে চিন্তা করুন মিস রায়। আপনার একমাত্র অবলম্বন, আপনার কাকা অসুস্থ। প্রচুর টাকা দরকার আপনার। অবশ্য আপনি যদি রাজি নাই হোন,

অন্য কাউকে দিয়ে আমি এই কাজটা করিয়ে নিতে পারব।
সুমিতা: ওঃ ভগবান।
অলক: ভগবান তো আপনার সঙ্গেই আছে মিস সুমিতা, আপনার কাকা। তিনি চলে গেলে আর কে থাকবে আপনার? আর একটা কথা, চাকরিটাও থাকবে কিনা, সেটাও আপনার হাতেই। (সুমিতা মাথা নিচু করে বসে পড়ে। আলো নেভে। আবার আলো চলে)
সুমিতা: কাকাকে বাঁচাতে এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।
মনো: তারপর!
সুমিতা: তারপর যা হয় আর কি? আমাকে দিয়ে বেশ কয়েকবার এই ধরনের কাজ করে নিয়ে কোম্পানি কোটি কোটি টাকা মুনাফা করে নিল। আর একদিন কোনো কারন ছাড়াই আমার হাতে ধরিয়ে দিলো সেই কাগজটা। যাতে লেখা আছে, ইউর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড। আমার চাকরি গেল, আর আমার বস মিঃ অলোক সান্যাল প্রমোশন পেয়ে সোজা মুম্বাই।
মনো: তারপর!
সুমিতা: তারপর তো আর কিছু নেই। কাকাকে বাঁচাতে পারলাম না। সহায়-সম্বলহীন। নিরাপত্তা হীন। তখন আমার মূলধন আমি নিজে। তবে বসের ঘর থেকে শেষবারের জন্য বেরোবার সময় একটা কাজ আমি করে এসেছিলাম।
মনো: কি?
সুমিতা: বেরোবার আগে একটা থাপ্পর আমি আমার বসকে উপহার দিয়ে এসেছিলাম। আর সেই রাগেই আজ (কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তারপর সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে চলে যেতে থাকে)
মনো: দাঁড়াও কোথায় যাচ্ছ? আবার ওই কালি মাখতে।
সুমিতা: মা!
মনো: শমিক তোমায় অস্বীকার করেছে, তোমার শ্বশুর তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি, আমি তো এখনো বেঁচে আছি। আমি এখনো এ বাড়ীর কর্তৃ, গৃহিণী। আমার কথাই এ বাড়িতে শেষ কথা। তোমার সৎ সাহস নেই? চিৎকার করে বলে উঠতে পারলে না, যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো? আমি এ বাড়ির বউ। এটা আমার বাড়ি, আমার সংসার। শাঁখা, সিঁদুর পড়িয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমার অধিকারে আমি এখানে থাকব। চিৎকার করে বলতে পারলে না?
সুমিতা: মা!
শমিক: মা! এ তুমি কি বলছ? অলক যা বলে গেল, তার পরেও—
মনো: হ্যাঁ তার পরেও। আমি আজ পঁয়ত্রিশ বছর সংসার করছি। আমি খুব ভাল করে জানি, সংসারে একটা মেয়ের স্থান কোথায়। নিজেকে তিল তিল করে বিলিয়ে দিতে হবে, তবু কেড়ে নিতে হবে সেই স্থান। কেউ এমনি এমনি তা দেবে না।
মনীশ: মনোরমা, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!
মনো: না পাগল হবো কেন? আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি। অসুস্থ হয়েছে তোমরা যারা এই অসুস্থ সমাজটাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা, তোমার একবারও মলির কথা মনে পড়ে না। তুমিই না আজ বললে, মলি যদি কলঙ্কের কালি মেখে ফিরে আসে, আমি কি করব? তখন বলতে পারিনি, এখন বলছি, আমি মলিকে ফেরাতে পারব না। আমার মলি এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। আমি কি তাকে ফেরাতে পারি?
সুমিতা: মা! (পায়ের কাছে বসে পড়ে)
মনো: ওঠো মা। আমার চার পাশে যদি এই চারটে দেয়াল থাকে, তোমার পাশেও থাকবে। কেউ তো আজকাল নিজের বাবা-মাকেই দেখে না। সেখানে তুমি এক অনাত্মীয়ের জন্য নিজের নারীত্বকে বিসর্জন দিয়েছ। তুমিতো দধীচি। আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে। তবে স্বামীর স্ত্রী বা শ্বশুরের বউমার পরিচয়ে নয়, তুমি থাকবে নিজের পরিচয়ে। তোমার পরিচয় তুমি সুমিতা।
(সুমিতা কাঁদতে কাঁদতে পায়ের কাছে বসে পড়ে। দূরে গান শোনা যায়, আমার এ দেহখানি তুলে ধর, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো। পর্দা পড়ে)

ফাগুন মাতন

জয়ন্ত মুখার্জী
ল্যাব এটেনডেন্ট, পদার্থ বিভাগ

‘ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল,’
সদ্য ফোটা কুসুম তোরা, রাঙিয়ে মন তোল।
ইচ্ছে ডানা মেলে তোরা,
রঙিন হাসি নজর কাড়া।
আয়রে তোরা মন গগনে, পেতে দিয়েছি কোল।
মনের কালো দূরে ঠেলে, মন মাতিয়ে তোল।
সদ্য ফোটা কুসুম তোলা, মন রাঙিয়ে তোল।

চেয়ে দেখ তোরা নীল দিগন্তে, লাগলো ফুলে আগুন,
মন মেতেছে রঙিন নেশায়, এসেছে রং-ফাগুন।
বাছা বাছির নেইকো সময়,
উচ্চ নীচ বা ইতর তো নয়,
মৌমাছিরা আমের বোলে গাইছে যে গান গুন গুন।
হারান হারুন, রাম রহিমে এক হৃদয়ে মন মাতন।
মন মেতেছে রঙে নেশায়, এসেছে ফাগ ফাগুন।

ওরে আয় সব দেখে যা রে, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,
দখিন হাওয়ায় ফুটলো পলাশ, নীল আকাশের কোণে।
পলাশ শিমুল লাজে রাঙা,
তিতলি তোরা রঙিন ডানায়,
খিলখিলিয়ে ওঠ রে তোরা, কচি সবুজ মনে।
তোরাই যে আজ আমার সুরে, আমার ফাগের গানে।
দখিন হাওয়ায় ফুটলো পলাশ, নীল আকাশের কোণে।

সুখ

পিংকন বিশ্বাস
অতিথি অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

মন পাখি খোঁজে সুখ
করে মুখ মলিন।
সুখের সঠিক সংজ্ঞা
যে বড়ই কঠিন।
সুখ বলে চিনি যারে
সে কি কেবলই পার্থিব।
নাকি আছে তার অন্য অর্থ
অবাস্তব আর অপার্থিব?
হীরা জহরতে মোড়া বলেই
আমি কেবল সুখী।
আর তুমি দুটি অন্নেই সন্তুষ্ট
তাই কী তুমি অসুখী?
সুখের খোঁজে অনেক নেশায়
ডুবে হওয়া শুধু অমানুষ
জীবনের নেশা পেয়েছে যে
সেই সুখী, সেই প্রকৃত মানুষ।

পরিণতি

পৌলমী সেন
অতিথি অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ

তারকেশ্বর স্টেশনে একটি ছেলে জুতোপালিশ করে— নাম কমল। তার বয়স বারো। জুতো সবসময় পালিশ করে সে তা নয় - এটা তার পার্ট টাইম কাজ। ছেলেটির বাড়িতে আছে তার বাবা কার্তিক ও মা সাবিত্রী। বাবার জুতোব্যাগ সেলাইয়ের একটি ছোট দোকান আছে আর মা কাগজের ঠোঙা বানায়। কার্তিকবাবুর সর্দিকাশির ধাত, মাঝেমাঝে মারাত্মক শ্বাসকষ্টও হয়। মা সাবিত্রী রোজ কুড়ি ডজন ঠোঙা বানিয়ে দোকানে দোকানে দেয়। সাবিত্রী গত দুই বছর ধরে টিউবারকিউলোসিস রোগে ভুগছে। এরকম পরিস্থিতিতে কিশোর কমল রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে কখনও প্লেন চালিয়ে বিমানচালক, কখনও লাঠি হাতে মাস্টারমশাই হওয়ার স্বপ্ন দেখে। কার্তিকবাবু তার আদরের ছেলেটিকে বাড়ির কাছে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছেন। কিন্তু ছেলের পড়াশোনায় মন নেই, স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই তার। তাই সে মাঝে মাঝে স্কুলে না গিয়ে তারকেশ্বর স্টেশনে জুতো পালিশ করে সকাল এগারোটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত।

ব্যস্ত যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ কমলের কাছে জুতো পালিশ করায়। এরকমই একদিন কমল যখন বলে 'পালিশ করবেন বাবু, পালিশ'। তখন একজন চাকুরীজীবী লোক এগিয়ে এসে বলে—

তোর নাম কী?

—কমল

—তুই স্কুলে যাস না কেন?

—পড়া না পারলে স্যার বকে।

—এখন তো শুধু বকে, আমরা তো কত মার খেয়েছি, তাও স্কুলে গেছি। তুই স্কুলে যাস না বাবা জানে?

—না

—কাল থেকে কি স্কুলে যাবি না হলে তোর বাবাকে বলে দেব।

এই বলে ভদ্রলোক চলে যান। বাবার কাছে খবর যাওয়ার কথায় ভয় পেয়ে কমল বাড়ি ফিরে আসে। মাকে চেঁচিয়ে বলে— 'মা ক্ষিদে পেয়েছে তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো'। ঘরে এসে কমল দেখে মার মুখ থেকে রক্ত বেয়ে বিছানায় পড়ছে। কমল তখন ভয় পেয়ে কাঁদতে থাকে। মা ঐ অবস্থাতেই বলে, 'যা দোকান থেকে বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়'। কমল বাবার কাছে দৌড়ে যায় কিন্তু হায়! বাবাকে নিয়ে ঘরে ফিরে দেখে মা তাদের ছেড়ে এই দুনিয়া থেকেই চলে গেছে।

মা মারা যাওয়ার মাসখানেক পরের এক রবিবার। ছুটির দিন বলে অন্য দিনের চেয়ে কমলের বাবার দোকানে ভিড় একটু বেশি হয় কিন্তু হঠাৎ কমলের বাবার শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় বাড়ি ফিরে আসে সে। মা নেই আর বাবারও যদি কিছু হয় ভেবে কমল ভয় পায়। রাতে কার্তিকবাবুর শ্বাসকষ্ট আরও বাড়ায় কমল পাড়ার ঘোষ ডাক্তারকে ডেকে আনলে তিনি কিছু ওষুধ দিলেও বেশি শ্বাসকষ্ট হলে হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন।

পরদিন সকালে টাকা রোজগারের জন্য কমল পুনরায় জুতোপালিশের বাক্স নিয়ে বসে। বেশ কয়েকজন তার কাছে জুতো পালিশ করে। বেলা ১১ টার সময় একটি ১৮-২০ কুড়ি বছরের ছেলে ছোট ব্যাগ রেখে কমলকে বলে, 'ভাই ব্যাগটা একটু দেখত আমি বাথরুম থেকে এক্কুনি আসছি'। কিন্তু সে আর ফেরে না।

খানিক দূরে একটি বড় সোনার দোকানে গত রাতে চুরি হওয়ায় পুলিশ কুকুর নিয়ে খুঁজতে বেরলে কুকুর গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কিছুক্ষণপর কমলের কাছে এসে সেই ব্যাগটায় চুরি যাওয়া গয়নাগুলি দেখতে পায়। তখন পুলিশ কমলকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। কমল যত বলে 'এই ব্যাগ আমার না, এক অচেনা দাদা ব্যাগটা একটু দেখতে বলে চলে যায়'—তা কেউ

শুনতেই চায় না। এমন সময় ইন্সপেক্টর অবিনাশ সেন থানায় এসে কমলকে দেখে চমকে যায় কারণ তার ছেলে সুমনকে একেবারে কমল এর মত দেখতে। তার উচ্চতা, গায়ের রং, নাক-চোখ-মুখ সব এক। সেই মুহূর্তে ইনস্পেকটরের মনে পড়ে তার যমজ ছেলে সুজনের কথা। দশ বছর আগে পরিচারিকার সাথে সুমন ও সুজন পানিহাটির মেলায় যায়। সেখানে সুজন হারিয়ে যায়। সুজনকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে ভাগ্যের পরিহাস ভেবে নেয় তার বাবা-মা। এইসব যখন ইন্সপেক্টর ভাবছিলেন তখন পুলিশ তিনজনকে (বিজয়, শ্যামল, তপন) সন্দেহ করে ধরে এনে লকআপে ভরে। এরপর ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসাবাদ করে কমলের থেকে জানে বিজয়ই তাকে ব্যাগ দিয়েছিল। বিজয় খুবই বেপরোয়া ও নিজে কাজ করতে পছন্দ করে আর বাকিরা বেশ ঠান্ডা মাথার লোক, তারা একে অপরে শাগরেদ ছাড়া কাজ করে না। ঘটনার সময় তারা একটি হোটেলে খাচ্ছিল। তদন্তে বিজয়ই আসল দোষী জেনে বাকিদের পুলিশ ছেড়ে দেয়।

তারপর ইন্সপেক্টর কমলকে নিয়ে কমলের বাড়ি গিয়ে দেখে কার্তিকবাবু শ্বাসকষ্টজনিত কারণে একেবারে মর মর। কোনরকমে জিজ্ঞাসা করে মৃত্যুপথযাত্রী কার্তিকের থেকে ইন্সপেক্টর জানতে পারে কমলই তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে সুজন। এই সন্তানহীন কার্তিকবাবুরাই পানিহাটি মেলার পাশের মাঠে একটি ছেলেকে বসে বসে কাঁদতে দেখে বাড়ি নিয়ে আসে। ইন্সস্পেকটর তখন নিশ্চিত হলেন এই তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে সুজন। এরপর তিনি কার্তিকবাবুর জন্য ঔষধ আনতে বাইরে যান আর কমল ক্লান্ত থাকায় পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে। আধঘন্টা পরে ঘুম ভাঙলে কমল পালিত বাবার ঘরে এসে দেখে বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে ও কার্তিক বাবুর হাতে ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরো তিনি নিজেই নিজের মাথায় মেরে বলিদান দিয়েছেন। আবার চিঠিতে লিখে গেছেন শ্বাসকষ্ট সহ্য করতে না পেরেই তিনি এ কাজ করেছেন।

এরপর ইনস্পেকটর ফিরলে কমল তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমার বাবা আর নেই'। তখন অবিনাশবাবু ছেলেকে বুকে টেনে বলে, 'কাঁদিস না বাবা, আমি তো আছি'। এইভাবে ছেলেটা আসল বাবা ও আসল পরিচিতি ফিরে পায়।

অপূর্ণতার পূর্ণতা প্রাপ্তি

পৌলমী সেন
অতিথি অধ্যাপিকা, (বাংলা বিভাগ)

সুচেতনার সাথে নিলয়ের প্রথম পরিচয় মলয়দার কাছে একাদশ শ্রেণিতে ফিজিক্স পড়তে গিয়ে। সেখানে নিলয়দের ছয়জনের একটা দল গড়ে উঠেছিল। অজস্রদিন অবসরে তারা একসাথে আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া করত। ব্যস্ত হট্টগোলের পৃথিবীতে শান্ত চুপচাপ মেয়েটিকে দেখে নিলয়ের জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা বারবার মনে হত—

'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ/বিকেলের নক্ষত্রের কাছে,
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে'।

প্রায়ই সুচেতনাকে একটা অল্প বয়সী ছেলে বাইকে করে স্কুলে দিতে আসত। কে সে তা জিজ্ঞেস করার সুযোগ হয়নি কোনদিন নিলয়ের। বর্ধমানের মেয়ে মছলন্দপুরের মাসির বাড়িতে থেকে পড়ে, হয়ত ছেলেটি তার বয়ফ্রেন্ড বা লোকাল গার্ডিয়ান হবে। নিলয়দের দলের বাকি চারজনের মধ্যে সুমনা-রাহুল এবং সুতনুকা-শরদিন্দু প্রেম করত। নিলয় সুচেতনাকে ভালোবাসলেও লাজুক হওয়ায় কোনদিন বলতে পারেনি। নিলয় একবার সুমনের কাছ থেকে জেনেছিল যে সুচেতনা বলেছে নিলয়ের কথা শুনতে তার খুব ভালো লাগে।

এরপর প্রায় কুড়ি বছর কেটে গেছে। কাজের চাপে নিলয়ের বিয়ে করা হয়ে ওঠেনি। নিলয় স্কুল-কলেজ পাশ করে W.B.C.S. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পাশ করে

বাড়ির কাছেই পোস্টিং পায়। স্কুল-কলেজের প্রায় সব বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ থাকলেও সেই সময় সুচেতনার মোবাইল না থাকায় তার সাথে কোন যোগাযোগের সুযোগ ছিলনা। ইতিমধ্যে সুমনা-রাহুলের ও সুতনুকা-শরদিন্দুর বিয়ে হয়ে গেছে। সুমনা-রাহুল I.T. সেক্টরে কাজ করে, থাকে ব্যাঙ্গালোরে। আর শরদিন্দু কলকাতার একটি কলেজে পড়ায়, তাদের একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়েছে। হয়ত সুচেতনাও এতদিন বিয়ে করে দুই ছেলেমেয়ের মা হয়ে গেছে।

গত দু'বছর হল নিলয়ের বাবা ব্রেনস্ট্রোকে মারা গেছে। তাদের বাড়ির কাছে আছে মা, সে আর একমাত্র কাজের লোক সবিতা মাসি। তবে নিলয়ের সারাদিনই কাটে B.D.O. অফিসে আধিকারিক হিসাবে। তারপর প্রতিদিন ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফিরে আধঘন্টা টিভিতে খবর শুনে জরুরী ফাইল দেখে ডিনার শেষে ঘুমিয়ে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে কোনো নিমন্ত্রণ থাকলে সেখানে যায়।

১লা ডিসেম্বর নিলয় মধ্যমগ্রামে এক কলিগের বিবাহবার্ষিকী পার্টিতে যায়, অন্য এক কলিগের গাড়িতে। নিজের চারচাকা থাকা সত্ত্বেও ড্রাইভার না থাকায় মা'র বারণ উপেক্ষা করে নিয়ে আসতে পারেনি। কারণ প্রায় ছয় মাস আগে নিলয় নিজে ড্রাইভ করতে গিয়ে একজনের পাঁচিলে ধাক্কা মেরে হাত-পা ভেঙে তিনমাস বিছানায় শুয়ে ছিল। যাইহোক, নিমন্ত্রণ বাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়ে আড্ডা দিতে দিতে রাত নটার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে ঠিক করে ট্রেনে করে ফিরবে। সাধারণত ট্রেন চড়ে না নিলয় খুব একটা। ট্রেনের কামরায় দূর থেকে গানের কলি ভেসে আসতে শোনে নিলয়। সেই গান ক্রমশ কাছে শোনে। গলার স্বরটা খুব চেনা চেনা মনে হয়। কাছে আসতেই নিলয় স্পষ্ট চিনতে পারে কোঁকড়ানো চুল টানা টানা চোখের ফর্সা মেয়েটিকে— এই সেই তার বলতে না পারা প্রেম। অনেক কষ্টে মুখে শব্দ না আসলেও নিজের সমস্ত শক্তি জড়ো করে নিলয় মেয়েটিকে ডাকে 'সুচেতনা তুমি'!

কয়েক সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলে না। তারপর মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি উল্টো দিকে হাঁটতে থাকে, নিলয় চিৎকার করে বলে 'সুচেতনা দাঁড়াও'। কিন্তু কোনো কথা না শুনে মেয়েটি ট্রেন থেকে নেমে পড়ে, নিলয়ও পিছুপিছু নামে। স্টেশনে নেমে মেয়েটি একটি গলির মধ্যে বস্তিতে ঢুকে পড়ে। নিলয়ও দৌড়ে সুচেতনাকে ধরে ফেলে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড় করায়। তখন সুচেতনা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সুচেতনার বাবার রাস্তার ফুটপাতে দোকান ছিল। মা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। কিন্তু নতুন মা সুচেতনাকে একদম সহ্য করতে পারতেন না তাই বাবা তাকে মছলন্দপুরে মাসির বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মাসি-মেসোর মেয়ে না থাকায় তাকে তারা নিজের মেয়ের মতোই দেখতেন আর যে ছেলেটা তাকে স্কুলে দিয়ে আসতো সেই ছেলেটা তার মাসতুতো দাদা। সুচেতনা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে যখন ভর্তি হতে যাবে ঠিক তখনই মেসোর প্রাইভেট কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়, দুর্ভাগ্যবশত দাদার তখনই ক্যান্সার ধরা পড়ে। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর দাদা মারা যায়। মেসো সমস্ত গয়না-বাড়ি বিক্রি করে পথের ভিখারী হয়ে বস্তিতে এসে প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আর মাসিও মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। তখন সুচেতনা অনেক চেষ্টা করেও চাকরি না পেয়ে টুকটাক কিছু কাজ করে কোনরকমে সংসার চালায়। বস্তিতে নিলয় তাদের ঘরে গিয়ে দেখে এই ডিসেম্বরের প্রচন্ড শীতে মাসি-মেসো মাটিতে শুয়ে আছে, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে। নিলয়ের পার্সে বেশি টাকা না থাকায় ছ'শো টাকা বন্ধু হিসাবে সুচেতনার হাতে দিয়ে বাড়ি চলে আসে। সেই রাতে নিলয়ের চোখে একটুও ঘুম আসে না। পরদিন ভোরে উঠলে মা দেখেই বুঝতে পারে নিলয়ের সারারাত ঘুম হয়নি। মা কারণ জিজ্ঞাসা করায় খানিকটা ইতস্তত করে নিলয় মাকে সুচেতনার কথা সবটাই খুলে বলে। মাকে জানায় সেই সুচেতনাকে বিয়ে করতে চায় ও তার মাসি মেসোকেও বাড়ি এনে রাখতে চায়। মাও একথায় সম্মতি দেয়।

সেইদিনই নিলয় অফিস থেকে ফেরার সময় সুচেতনাদের বস্তিতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে সুচেতনা একটা কাঁথা সেলাই করছে পুরনো ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে। নিলয়কে দেখে সুচেতনা একটা পিড়ি এগিয়ে দেয় বসার জন্য। স্কুলজীবনের গল্প করতে করতে সুচেতনা বলে তার জীবনের অনেক ইচ্ছাই অপূর্ণ রয়ে গেছে।

তখন নিলয়ও জানায় তারও জীবন অপূর্ণ আছে। তখন সুচেতনা বলে, 'তুমি তো বড়লোক মানুষ, তোমার আবার কি অপূর্ণ'। নিলয় কয়েক মুহূর্ত সুচেতনার দিকে তাকিয়ে থেকে বলেই ফেলে তার একজনের অভাবে সংসারধর্মটাই করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেদিনের সেই লাজুকভাব ভেঙে নিলয় বলেই ফেলে সুচেতনাকে আমি কত ভেবেছি—

'জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার
তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার'।

এবার যদি তুমি আমায় বিয়ে করো তাহলে আমার জীবনের অপূর্ণতা পূর্ণতাপ্রাপ্তি হবে ।

মোঘল রসুই খানার ঐতিহ্য পরম্পরা

লিপিকা ঘোষ রায়
অতিথি অধ্যাপিকা, (ইতিহাস বিভাগ)

বিশ্বের দরবারে মোঘল ইতিহাস নানান রূপে এসেছে। মোঘল সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য এক অসামান্য প্রভাব ফেলেছিল। সেই সময় থেকেও রন্ধন শিল্পেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল। খাদ্যরসিক মানুষের কাছে তাই মোঘল দরবারে খাবারের ইতিহাস জানার আগ্রহ অবশ্যই থাকবে। আকবর, শাহজাহান, ওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে রাজকীয় রান্নার সঙ্গে নিত্যদিনের সুস্বাদু রান্নার যে ব্যবস্থাপনা করা হত তার একটি চিত্র আমরা দেখতে পাই।

মোঘল যুগের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরী' থেকে প্রায় সাতটি আইনে খানাপিনার কথাই আলোচনা হয়েছে। তবে বাবরের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে তিনি হিন্দুস্থানের খাবারের ব্যাপারেও অত্যন্ত না পসন্দ স্বভাবের মানুষ ছিলেন। কোন খাবারের ব্যাপারে তাঁর খুব একটা রুচি ছিল না। তিনি এদেশে কাবলি মেওয়ার চাষ শুরু করিয়েছিলেন।

মোঘল বাদশাহদের খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। একটি বড়ো বাবুর্চি খানার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। দপ্তরের প্রধান ছিলেন মীর বকাওয়াল। তাঁর সহযোগিতার জন্য ২ জন সহকারী ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র খাবার তৈরি করার জন্য মোঘল দরবারে রাখা হত বিভিন্ন জাতের বাবুর্চি। মোঘল দরবারে খাবারের ব্যাপারে এলাহি সমারোহ ছিল। এই সময় একটি বিশেষ খাবারের উল্লেখ করা যেতেই পারে— তাহল খিচুড়ি। যেটি রান্না করা হত পাঁচসের চাল আর পাঁচ সের ডাল, আর পাঁচ সের ঘি দিয়ে। নানান রঙের পোলাও এই যুগেও এক বিখ্যাত খাবার ছিল যেটা লাল, কালো, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি রঙের হত। মূলত জাফরান দিয়ে এই রং-বেরঙের পোলাও তৈরির রীতি ছিল।

গুলবদনের লেখায় 'নান', রুটির কথা জানতে পারি। যেটা নিরামিশ খাবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'নান-ই-তাফটান' (Naan-Taftaan), নান-ই-বেসানি (Naan-E-Basani), নান-ই-জাওয়ার (Naan-E-Jowar), নান-ই-ওয়ারই (Naan-E-Warqi), নান-ই-কুরমা (Naan-E-Khurma) নান এই রেসিপিগুলি এই সময় প্রচলিত ছিল।

চালের গুঁড়ো, বাদাম আর মুরগির কিমা গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে লোভনীয় জিনিস তৈরীর কথাও জানা যায়। এরপর চাল ও মাংস নিয়ে খাবার তৈরীর কথা বলা যায় যা নামকরণ করা হয় 'দুজদ বিরিয়ন'। এই যুগের বিরিয়ানি এরই রকমফের রূপে পরিচিত। কিমা পোলাও, শুক্লা, খাবার এই যুগের সৃষ্টি।

এইসময় 'হালিম' জাতির খাবারেও প্রচলন ছিল। গাজর ও তরকারি সহযোগে এই 'হালিম' খাবার ও প্রস্তুত হত। তবে একথা বলাই বাহুল্য সে যুগের অনেক খাবারই কলকাতার বড় বড় রেস্তোরাঁ গুলিতে সেই ধারা বহমান রয়েছে। যেমন - বিরিয়ানি, কাবাব, মুর্গ-মুসলাম, মুর্গ-মশালা, দোপিয়াজি, কালিয়া, ভর্তা সিরাজী, শাগ্ চাউলাই (Saag-Chaulai) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তবে মোঘল বাদশাহ ও আমিররা উভয়ই ছিলেন মুসলমান, তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায় যে আকবর ও জাহাঙ্গীর উভয়ই রোজ মাংস খাওয়াটা তাদের কাছে সৎ কাজ বলে মনে হত না। এই কারণে তারা প্রত্যহ মাংস খেতেন না। প্রজাদের মধ্যে বেশিরভাগ হিন্দু ছিলেন। তারা ভাত, রুটি, মাখন, ঘি ছাড়া অন্য কিছু খেতেন না। এমনকি গাছের প্রাণ আছে, এইসব ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা শাকসবজিও খেতেন না।

আবুল ফজল এর এক চমকপ্রদ উদাহরণ দিয়েছেন।

মিঠা ফল	শুকনো ফল	টক ফল
আম	নারকেল	কামরাঙ্গা
আনারস	সুপারি	ফলসা
কমলা		

মোঘল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় বিভিন্ন ফল হিন্দুস্থানে উৎপন্ন করার একটা প্রয়াস দেখা যায় যেমন: তরমুজ, বাদাম, পেস্তা, আঙুর। কাবুল, কান্দাহার থেকে চেরী, বেদানা, আপেল নিয়ে আসা হত।

জাহাঙ্গির, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব ফলের স্বাদ গ্রহণ করতেন। দিল্লির দোকানগুলিতে বাদাম, পেস্তা, আখরোট, কিসমিস, শুকনো ফল পাওয়া যেত। মোগল আমলে খাবারের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে মার্কেটের একটা স্বল্প ধারণা দেওয়া যাক—

আইন-ই-আকবরী হিসাবে এক মণ [বর্তমান ২৭-২৮ সের বা ৫৫ ১/২ পাউন্ড] ৪০ দাম = ১ তঙ্কা বা টাকা

গমের দাম ছিল = ১২ দাম

একমন যব ছিল = ১৬ দাম

কাবলি ছোলা দাম ছিল = ১৬ দাম

চাল দাম ছিল = ২০ দাম

এখনকার মানুষ জানলে কিছুটা চমৎকৃত হবেন যে এই সময় মাংস খুব সস্তায় পাওয়া যেত। ১ টাকায় চারটে ছাগল পাওয়া যেত। ভেড়ার মাংস ছিল ৬৫ দাম।

মোঘল ঐতিহ্য অনুসারে খাদ্য উপহার প্রদান ও সংস্কৃতির একটা অংশ হয়ে গিয়েছিল। মোঘল দরবারে বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা এসেছেন এবং মুঘল খাবারও গ্রহণ করেছেন। অনেকের সঙ্গেও এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গেছে।

খাবারগুলি স্বর্ণ ও রূপার থালায় পরিবেশিত হত। নুরজাহানের একটি খাবারের প্লেট ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। প্লেটের প্রান্তটি সোনার থ্রেড রুবি, পান্না এবং সবুজ কাঁচের ইনলেস দিয়ে তৈরি পদ্মের নকশায় সজ্জিত।

যখন এই খাবার পরিবেশিত হত তখন সামনে পিছনে গুর্জবরা দ্বারা নিযুক্ত থাকত। মাটির দস্তর খানা বিছিয়ে তার উপর খাবার পরিবেশন হত। আমির ওমরাহরা লম্বা দুই সারিতে কিংবা ত্রিভুজের আকারে বসে তাঁরা আহার গ্রহণ করতেন। প্রথমে একটি পাত্রে হাত ধোয়ার জল আসত। তারপর সফরটি মাঝখানে বসে আলাদা আলাদা পাত্রে খাবার পরিবেশন করতেন। অনেক সময় সফরচির জায়গায় বেগমরাও বসেও খাবার বিষয়ে তদারকি করতেন। সেখানে সবার প্রবেশ অধিকার ছিল না। মোঘল যুগে খাবারের ইতিহাস খুব স্বল্প পরিসর আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। এই স্বর্ণযুগের খাবারের ইতিহাস এক বিশাল পরিসরে ব্যাপ্তিমান। সামান্য কিছুই তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) মুঘল আমলের খানাপিনা - তপন রায়চৌধুরী

২)The Mughal Feast A Transcreation Nuskha-E-Shajni By Salma Yusuf Husain Published In India Roli Book-2019

৩) IHM NOTE-Kamal Kant Goutam

বিশ্রুতি ও পুনর্জন্ম

জয়িতা সুর
অতিথি অধ্যাপিকা,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

। ক।
পঞ্চভূতে বন্দী যে বিলীয়মান—
সে, সহজ আকাঙ্ক্ষা। সহজ আনন্দ নয়।
নিষ্ক্রান্ত বিবেক! সখপূর্ণ যদি -
অবিনশ্বর সঙ্গী তুমিও কী পরিতৃপ্ত?
পৌরুষ যদি পদান্তর—তবে পুরুষ তুমি প্রিয় নও।
কামনাগন্ধী ইতিহাস সাক্ষী জায়া বিভ্রান্তির;
শোক—তাপ জয়ী বীর শুধু আর্যা কারুবাকীর।
রিক্ত হৃদি অদেয় কী আর!
কোনো উপল হৃদিতল, প্রত্ন খনন এড়িয়ে,
দৈনন্দিন শ্যাওলার মলমলে পরম যত্নে ঢেকে রাখবে
চিরসত্য—'
'দেবানাম প্রিয় প্রিয়দশী'
দেবনাগরী আমি - বিশ্রুত হলাম।

। খ।
যুদ্ধলগ্নের অবাঞ্ছিত অনুভূতিরা আজ অতীত—
পায়ের তলায় কংক্রিট মাটির আস্বাদ,
অস্ফুট হাসিতে তৃপ্তি। পরজীবী ভেলামেন কৃতার্থ আমার
অপেক্ষায়—
এমনটাই তো স্বপ্ন ছিল!
কিন্তু তুমি কোথায়?
হাজার আদরের ভিড়ে কী প্রিয় উপহার ঠাঁই নিয়েছে পথের
ধুলায়!
ঠিক যেমন উৎসব দিনে রাশি রাশি ফুল সাদরে উপেক্ষিত
হয় আঙিনায়।
বেশ...
কিন্তু ছিন্নবীণার শেষ তার ও বাঙ্ময়।
তাই, তাই তো, রোজ ব্রহ্মলগ্নে সূর্যের কুমারী আলো, যখন
স্পর্শ করে ঊষর পৃথিবীকে—
ঠিক তখন, বেল ফুলের গন্ধ মাখা একঝলক তাজা বাতাস
পাঠাই তোমায়।
হোক্‌না প্রশ্বাসের অজুহাত—
তবুও মুহূর্তের আলিঙ্গনে যদি স্পন্দিত হয় নৈব্যক্তিক
হৃদয়।
সুহৃদ আমি - পুনর্জন্মের প্রতীক্ষায়...

রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীত্বের পালাবদল

জয়িতা সুর, অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

১৮৮৩ ও ৮৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে তারিখবিহীন একটি ছোটগল্প 'খাতা'তে আমরা দেখি সাত বছরের ছোট্ট উমাকে। সে লিখতে, পড়তে জানত। নিজের মনের কথা লেখার খাতাটি সাথে করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গিয়েছিল সে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য এই ছিল যে, হিন্দু সংস্কারের সমর্থক তাঁর স্বামী প্যারীমোহন মনে করত, হিন্দু স্ত্রী শিক্ষিত হলে সংসার উচ্ছন্নে যায়। সে প্রবন্ধ লিখেছিল—

> "শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রী শক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয় তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে দাম্পত্য শক্তি বিনাশ শক্তির মধ্যে বিলীন সত্তা লাভ করে। সুতরাং রমণী বিধবা হয়।"

—বলাবাহুল্য, উমা যেদিন স্বামীর নিষেধ ভুলেছিল, সেদিন তার খাতা হারিয়েছিল। স্ত্রী শিক্ষিত হলে বিধবা হবে আজ এ তথ্য আমাদের কাছে যতটা ব্যঙ্গাত্মক তখন, বোধহয় সেই বোধোদয় হয়নি। যদিও ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের স্কুল বুক সোসাইটি প্রকাশিত স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক বইটিতে স্ত্রী শিক্ষা ও বৈধব্যের মধ্যে সমীকরণ প্রণীত হয়েছিল। তবে আনন্দের কথা

এই ছিল যে, গল্পের উমারা তাদের খাতা হারালেও বাস্তবের সব উমারা খাতা হারাইনি। ১৮৮৩ তেই আমরা পেয়েছি এই বাংলার প্রথম দুই মহিলা স্নাতক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসুকে। রবিঠাকুরের গল্পে উমা আর তার খাতা বুঝি অজান্তেই পাঠক মনে রেখে যায় সেই পালাবদলের সংকেত।

এই বঙ্গ সহ সমগ্র ভারতের অধিকাংশ নারীরাই তখন যুদ্ধ করছে মনুসংহিতায় নির্ধারিত নারী আচরণের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁচে থাকার। জীবনের সর্বস্তরে স্বাতন্ত্র্যহীনতা প্রতিরুদ্ধ করছিল তাদের স্বাধীন বৃদ্ধি ও বিকাশের পথ। বহির্বিশ্বে ততদিনে শুরু হয়েছে নারীত্বের উত্তরণ। ১৮৫৭-র ৮ই মার্চ আমেরিকার বস্ত্র শিল্পী নারী শ্রমিকরা কাজের সময় ও মজুরি নিয়ে ধর্মঘটে সামিল হয়ে নারী আন্দোলনের এক পালাবদলকে চিহ্নিত করেছে। ১৯১০-এ ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ কম্যুনিষ্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে গৃহীত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তাব। ১৯১৪ এর ৮ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই ১৯১৪ সাল রবীন্দ্রগল্পে নারী উত্থানের একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এই বছর প্রকাশিত হয় 'স্ত্রীর পত্র'। রবীন্দ্রনাথ রানীচন্দকে বলেছিলেন—

> 'প্রথম আমি মেয়েদের নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পারবেন কেন? তারপর যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি'

—কিন্তু পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতায় সরাসরি মৃণাল হয়ে অবতীর্ণ হওয়ার আগে মাঝের বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেকটা অচেতন ভাবেই প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রকাশের সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন তাঁর পরিচিত মানবজীবনের বাস্তব দিকগুলিকে অনুভূতির রসে জারিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লেখা চিঠিতে তিনি স্বয়ং 'দেনাপাওনা'কে তাঁর প্রথম ছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। এই গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রনে প্রভাব ফেলেছিল সমকালীন একটি মর্মান্তিক ঘটনা— স্নেহলতা দেবীর আত্মহত্যা। তাঁর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে পণআগ্রাসী পাত্রপক্ষ ও কন্যাদায় উভয়ের হাত থেকে বাঁচাতে বিয়ের আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন ও তার কারণ প্রতিবাদী ভাষায় একটি চিঠিতে লিখে রেখে যান। ঘটনাটিকে সমকালীন রাজনৈতিক জগৎ ও সংবাদপত্রের দুনিয়ায় আলোড়ন পড়ে। 'দেনাপাওনা' ছিল সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রথম সাহিত্যিক প্রতিবাদ। নিরুপমা পিতাকে বলেছিল—

> 'বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, তোমার গা ছুয়ে বললুম।'

পরবর্তীতে 'সাধনা'পর্বের রবীন্দ্র ছোটগল্পগুলিতেও সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী নির্যাতনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

> '...সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক রণ্যচ্ছেদন করবার জন্য একে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না'।

—তাই এই পর্ব থেকেই রবিকিরণে আলোকিত নারীরা, একটু একটু করে নিজেদের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান সম্পর্কে সচেতনভাবে কিছুটা হলেও পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন—'কঙ্কাল' গল্পে কঙ্কালের পার্থিব সৌন্দর্যময়ী সত্তা মেনে নেয়নি ডাক্তার শশীশেখরের অবমাননা মূলক সিদ্ধান্ত। শশীশেখর তার শাস্তি পেয়েছে। 'ত্যাগ' গল্পে গ্রাম্য প্রতিহিংসার রাজনীতি ও বিধবা-বিবাহ কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মিলিত সমস্যাকে কুসুম অতিক্রম করেছে হেমন্তের ভালোবাসার শক্তিতে। 'মহামায়া' গল্পে কৌলিন্য, জাতিভেদ ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভালোবাসা হয়তো হেরে গেছে, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ জিতেছে। অপুত্রক, ব্যাধিগ্রস্ত হরসুন্দরী নিজেরই বহুবিবাহ নামক কুপ্রথাকে নিজের সংসারে ডেকে এনে আমৃত্যু শরীরী এবং অশরীরী মধ্যবর্তিনীকে অতিক্রম করতে পারেনি। 'সমাপ্তি'র মৃণ্ময়ী প্রতিষ্ঠান ও গতানুগতিকতাকে অগ্রাহ্য এবং অতিক্রম করার মনোভাব রেখেছে। 'প্রতিহিংসা'র ইন্দ্রাণীর চরম আত্মসম্মানবোধ এবং কর্তব্যপরায়ণতা নারীর স্বতন্ত্র স্বরূপকে উপলব্ধির সাধনার

সোপান হয়ে উঠেছে। আছে মানভঞ্জন—এর গিরিবালা বার বিলাসে মত্ত থাকা স্বামীর কাছে মাথা নত না করে সমাজে নারী ও শিল্পী হিসাবে নিজের অমূল্য সত্তাকে চিহ্নিত করেছে। 'দিদি' গল্পে শশীমুখী নিজের নাবালক বৈমাত্রেয় ভাই ও তার সম্পত্তি কে রক্ষা করার জন্য নিজের লোভী স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। চন্দরার মৌনতা শান্তি দিয়েছে এই সমাজের অদ্ভুত মানসিকতাকে, 'বউ গেলে বউ পাব, কিন্তু দাদা গেলে দাদা ফিরে পাবো না' আর 'মরণ' এর ধিক্কার এক ধাক্কায় স্বামী, সতীত্ব ও পরকালের ধর্ম নামক সংস্কারকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। 'ভারতী'র খাতে প্রবাহিত 'নষ্টনীড়'এর চারুও এদেরই উত্তরাধিকার। চারুলতা, অমলের প্রতি তার অধিকারবোধকে আপন সত্য বলে জেনেছে। সদ্যজাগ্রত নারীত্বে স্বাধীন প্রেমের পীড়ার সাথে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করেছে সে। ঘর ভাঙেনি। বাহ্যিক শুচিতা রক্ষা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ আত্মসাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে।

'নারীর মনুষ্যত্ব'র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'আমাদের দেশে মেয়েদের পক্ষে লেশমাত্র স্বাতন্ত্র্য দাবি করলে পুরুষমহলে তুমুল উত্তেজনা উপস্থিত হয়।'

কিন্তু দমবন্ধ করে আত্মার মৃত্যু নিশ্চিত করার থেকে বোধ হয় স্বাতন্ত্র্যের দাবি সঙ্গত। তাই সেই দাবির তুমুল উত্তেজনা নিয়ে এসেছিল 'সবুজপত্র'—এর উদ্ভাসিত নারীরা।

সময়টা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারায় বেশ বড় রকমের পরিবর্তন। পালাবদল নারী চেতনার উদ্ভাসে, দৃঢ়চেতা নারীত্বের অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ে লেখা গল্পগুলি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে ছিল স্ত্রী মানে শুভকর্মের সহভাগিনী হয়ে ওঠা, বিবেচনাহীন আজ্ঞাবহ দাসত্ব নয়। সহধর্মিনী সত্তা সমগ্র নারীত্বের একটা অংশমাত্র। যেমন ২৭ নং মাখন বড়াল লেনের মৃণাল। গৌরীশংকরের আত্মজা হৈম। শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণী। বোষ্টমী। নীলরঙের সেই পত্র লেখিকা অনিলা। এদের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে। এটা সকলে শেষপর্যন্ত নিঃসঙ্গ চরিত্র। এই নিঃসঙ্গতা মার্জিত। 'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' নিয়ে সাংসারিক মঞ্চে সুখী দাম্পত্যের অভিনয়ের অংশীদার তারা হতে পারেনি। তাদের ব্যক্তিসত্তা সমাজ-সংসারের বাইরে কোন না কোনভাবে ঠেলে তাঁদের করে তুলেছে তথাকথিত অসামাজিক। যেমন—স্নেহলতা দেবীর আত্মহত্যার ফলশ্রুতির একটুকরো 'স্ত্রীর পত্র'—এও পাওয়া যায়—

> 'দেশসুদ্ধ লোক চোটে উঠল। বলতে লাগলো মেয়েদের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরা একটা ফ্যাশন হয়েছে।'

—কিন্তু ২৭নং মাখন বড়াল লেনের মেজ বৌ এই দেশসুদ্ধ লোকের বাইরে ছিল। তাই গল্পে বিন্দুর আত্মহত্যাকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিল। রূপসী বিবাহিতা নারীরূপে পতিব্রত্যের গৌরব, বংশ গৌরব ও আভিজাত্যের মিথ্যা দম্ভকে তুচ্ছ করে 'মেজ বৌ' মরে যখন মৃণালের জন্ম হল, তখন নবজন্ম মুহূর্ত থেকেই সে হলো পুরুষের চরণতলাশ্রয় ছিন্ন। তার বিপ্লবী ভাই শরৎ বিপ্লববাদের উদারতা নিয়ে এই নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্তিমতী হতে সাহায্য করেছে তাকে। মৃত্যুর পথকে প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে বেছেছিল 'হৈমন্তী'র হৈম। তার স্বামীর দুর্বল পৌরুষ ভালোবাসার শক্তিতে সোচ্চার হতে পারেনি। তাই মেরুদণ্ডহীন স্থূল পারিবারিক জীবনে সত্তা ও আত্মার অবক্ষয় থেকে মুক্তি নিয়ে, মর্ত্য ও নৈতিকতা আঁকড়ে ধরে, নির্লোভ জগতের উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। 'বোষ্টমী'র আনন্দী বলেছে—

> 'পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে বাসিয়াছে— আমার ছেলে আর আমার স্বামী। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।'

গুরুর কাছে নারীত্ব বিসর্জনের মধ্যে তুষ্টি খুঁজতে চাইনি। আত্মসম্মান ও আত্ম মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে আপন মহিমা।

'পয়লা নম্বর'-এর অনিলা প্রতিবাদী নীল রঙের চিঠি লিখেছে তাঁর মুক্তির বার্তা। সে তার স্বামী ও প্রেমিক উভয়কেই ত্যাগ করছে মুক্তির সন্ধানে। সতীত্বের লোক বা প্রিয়তমের আস্বাদ তার আলোকিত গন্তব্যের পথে বাঁধা হতে পারেনি। 'অপরিচিতা'র কল্যাণী তাঁর উপযুক্ত পিতার

উপযুক্ত সন্তান। পরিচিত-অপরিচিত সকল গণ্ডী অতিক্রম করেছে তার পণপ্রথা ও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। সমকালীন সময় সে বৈপ্লবিক চেতনার এক কল্যানী রূপ।

'সবুজপত্র'-এর বিপ্লবী মানসিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায় শারদীয় 'আনন্দবাজার' ও 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত 'রবিবার', 'ল্যাবরেটরী' 'শেষকথা' এবং প্রায় একই সময়ে লেখা 'বদনাম' গল্পে। প্রথম তিনটি গল্পই 'তিনসঙ্গী'। এই গল্পগুলিই প্রমাণ করে রবি ঠাকুর চির আধুনিক ও বাস্তববাদী। ততদিনে মনু নির্ধারিত নীতিবোধের অবগুণ্ঠন কাটিয়েছে নারী। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ততদিনের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তার অভিঘাতে পালাবদল ঘটেছে। তারই অভিঘাতে আন্দোলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবন সায়াহ্নে আঁকা এই আধুনিক মনস্কারা।

যেমন— 'বদনাম'-এর সৌদামিনী। পুলিশ অফিসারের পতিব্রতা স্ত্রী, তবে স্বদেশী চেতনায় আলোকিত। তাই স্বদেশ বিরোধী কর্মে পুলিশ স্বামীর সহভাগী নয়। আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিকদের মাধ্যমে দেখে সত্যকারের পৌরুষকে। যা দুর্লভ। তাদের রক্ষা করতে বদনামকে ভয় পায়না। বলে—

'লোকে বলবে না সতী, বলবে না সাধ্বী,
বলবে দজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের তিলক
আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সিঁদুর কপালে।
আর তুমি যদি মানুষের মতো মানুষ হও
তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।'

'ল্যাবরেটরি' গল্পে আসল বিক্রিয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যের তেজে। নন্দ কিশোর ও সোহিনীর বিবাহ প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও ব্রতের মেলবন্ধন। মৃত নন্দকিশোরের বিজ্ঞানাগারকে রক্ষা করাই সোহিনীর বৈধব্য ব্রত পালন। সেই ব্রত পালন করতে গিয়ে সোহিনী সতীত্বের পুরনো ধারণাকে ভেঙে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন সোহিনীকে সবাই বুঝবে না। তবু নষ্ট মূল্যবোধের মধ্যেও তিনি মানবাতমার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

রবিবার-এর 'বিভা' চেয়েছিল অভীক দায়িত্ববান হোক। অভীক বুঝেছিল। তাই বলেছিল—

'তোমার কাছ থেকে দূরে এসে ভালোবাসার
অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার
মনের মধ্যে, যুক্তি-তর্কের বেড়া পার করিয়ে
দিয়েছে আমাকে—
একদিন বুঝতে চেয়েছিল বুদ্ধি দিয়ে, এবার
পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।'

আধুনিক অভীক। তার উপলব্ধিতে প্রকাশিত হয়েছে বিভা—সেই নারী যে গড়তে জানে। ঠিক যেমন 'শেষ কথা'র অচিরা। সে জানে নারীর জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত এবং পুরুষের নৈর্ব্যক্তিক। অচিরার তপস্যা জীবনকে পবিত্র করার, উজ্জ্বল করার। সেই উদ্দেশ্য চ্যুতিতে অচিরা ভীত। তার ভালোবাসার মানুষ, নবীনমাধব, নিরাবেগ বৈজ্ঞানিক। অনুভব করেছে অচিরার ভালবাসা অধিকার আদায়ের নয়। সে ভালবাসার সত্যকে সম্মান করার জন্য পরমপ্রিয়কে মুক্তি দিয়ে, নিজে মুক্তি পেতে জানে।

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'রা এভাবেই তাঁর লেখনী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজেদের লড়াই নিজেরাই করেছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে। রামসুন্দরী দেবী, কৈলাস বাসিনী দেবীর মতো প্রণম্যদের মানসিকতার উত্তরাধিকার বজায় রেখেছে। কারো এগিয়ে যাওয়া মানে, অন্যকে পিছিয়ে আনা নয়। কারণ নারী জানে, 'তুমি যারে নিচে ঠেলো/সে তোমারে টানিবে যে নিচে'। নিজের একার লড়াইয়ে জিতে সমাজে সমানাধিকারের প্রশ্নে সে কেবল পুরুষকে বলতে চেয়েছে—

'ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন
যাচি কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি
আছো, আমি আছি

—জীবনের পালাবদল বোধহয় এভাবেই ইতিহাসে চিহ্ন রেখে যায় ।

ঋণ স্বীকার:

১) গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।
২) ছোটোগল্পের বিচিত্র কথা, সরোজমোহন মিত্র, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।
৩) রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ— বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য বিচার, ড: স্বস্তি মন্ডল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

প্রবচন

গৌরদাস সরকার
সহকারী অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ

জামা প্যান্ট পরে অজয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল। দু পা এগিয়ে ডানদিকের গলি ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলো। কিছুটা গিয়ে ঝন্টুদার চায়ের দোকানের বেঞ্চটায় বসে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলো। উদ্দেশ্যহীনভাবে খবরের কাগজের পাতাগুলো উল্টাতে লাগলো। পাতা উল্টাতে উল্টাতে কখন যে ঝন্টুদা চা দিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। শেষে যখন চায়ের চুমুক দিল তখন সেটা আর চা নেই শরবত হয়ে গেছে। সেটাকেই কোনরকমে গলাধঃকরণ করে পয়সা মিটিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে যাবে এমন সময় খেয়াল হলো দেশলাইটা বাড়িতে ফেলে এসেছে। অগত্যা ঝন্টুদার শরণাপন্ন হতে বাধ্য হল। মনটা আর এক প্রস্থ বিরক্তিতে ভরে গেলো। এই সামান্য ব্যাপারে অন্যের কাছে হাত পাততে হলো বলে। এমনিতেই মাথাটা ভার হয়ে আছে। বাবার গম্ভীর গলায় উচ্চারিত 'অপরচ্যুনিটি কামস নো মোর' শব্দগুলো যেন অজয়ের মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মেরে চলেছে। শব্দগুলো অজয় জীবনে এই প্রথম শুনছে তা নয়। এর আগেও বহুবার বাবাকে কথাগুলো বলতে শুনেছে। তবে তখন কথাটা বাবা অজয়কে বলেননি। বাবাকে অজয় এও বলতে শুনেছে 'স্ট্রাইক দা আয়রন হোয়াইল ইট ইজ হট'। দুটো প্রবাদকেই অজয় সমার্থক বলে মনে করে। অপরচ্যুনিটি তৈরি করা এবং আয়রন কে হট করার মূলে যে অনেস্ট ইনডেভার তার প্রতি সযত্ন উপেক্ষা অজয়কে বিস্মিত করে তোলে। প্রথম প্রবাদটির 'কামস' এবং দ্বিতীয় প্রবাদটির 'ইজ' অজয় এর কাছে একই মেসেজ দেয়। সেই মেসেজটি বলে 'সুযোগের অপেক্ষায় থাকো' 'সুযোগ পেলেই কাজে লাগাও' প্রবাদ দুটি একই জীবনদর্শন থেকে উঠে আসা বলেই মনে হয় অজয়ের। আর এই দর্শনটিকে অজয় সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে না পারলেও মনে মনে একটি সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে তার বাবা অন্তত এই প্রবাদ দুটির স্রষ্টা নন। আবার অজয়ের এও মনে হয় প্রবাদ দুটিকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখার এবং ঘৃণা করার মানুষও সে একা নয়।

মানুষের তৈরি প্রবাদগুলো অজয়ের মাথাটাকে কেমন যেন গুলিয়ে দেয়। মাথাটা গুলিয়ে গেলেও অজয় নিজের মতো করে একেকটি ব্যাখ্যা তৈরি করে নেয়। সেখানেও সেভাবে কেউ কেউ হয়তো বলে উঠবে নও তুমি একা নও, আমি আছি সাথে। কেউ সাথে রইল বা না রইল তাতে অজয়ের কিছু যায় আসে না। নিজের চিন্তা চেতনায় যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বা যার প্রতি ঋণাত্মক মনোভাব গড়ে ওঠে তার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করার মানুষ সে নয়। গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে অজয় আবার কখনো কখনো দ্বিধাগ্রস্থও বটে।

হাঁটতে হাঁটতে অজয় এসে পৌঁছালো পার্কের কাছে। বাঁধানো গাছের তলাটা তখনো কলকাকলিতে ভরে ওঠেনি। অজয় গিয়ে বসলো সেখানে। গাছের ছায়ায় বসে ঝিরঝির বাতাস গায়ে মাখতে মাখতে অজয়ের মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল। অল্প দূরে পাতাবাহারের গাছগুলো মৃদুমন্দ বাতাসে যেন দুলে দুলে নেচে উঠছে। একটা গাছের তলায় দুটো চড়াই পাখি আপন মনে খেলে চলেছে। তারা একে অন্যকে কি যেন সব বলাবলি করছে। অজয়ের মনে হল তারা কোনো এক মজার ব্যাপার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, আর পরম আনন্দে তার রসাস্বাদন করছে। সেই মুহূর্তে অজয়ের মন চাইলো ওদের মতো পাখি হয়ে যেতে। চকিতে অজয় বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত হিমেল পরশ অনুভব করলো। স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাস্রোত ধাক্কা খেলো, সঙ্গীহীনতার সলিলে। সেদিনের কথা আজও বেশ মনে আছে, অজয়ের। ছোটকাকাকে সে বলতে শুনেছিল আরে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'। কোন প্রসঙ্গে কাকার এই মন্তব্য তা অজয়ের অজানা ছিল না। সেদিন কাকার এক বন্ধু এসেছিল

ওদের বাড়িতে বেড়াতে। বন্ধুর প্রবল আক্ষেপ ছেলে নেই বলে। একটি মাত্র মেয়ে, মেয়ে যত বড় হচ্ছে বন্ধুর ছেলে না থাকার আক্ষেপটা তত বাড়ছে। অজয় এই আক্ষেপের যথার্থতা উপলব্ধি করতে তো পারলোই না বরং আগের জেনারেশন এর মধ্যে জেন্ডার বায়াসনেস এতটা প্রবল দেখে তাঁদের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা হারালো। সেই ছোটকাকাই আবার নিজের ছেলের কোন কাজে বিব্রত হয়ে বলে বসল 'দুষ্টু বলদ এর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো'। অজয় বুঝতে পারেনা দুষ্ট বলদ এর চেয়ে শূন্য গোয়াল যদি ভাল হয় তবে নেই মামার চেয়ে কানা মামা কি করে ভাল হয়!

অজয় তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। একদিন ক্যান্টিনে বসে চা খাচ্ছে। পাশের টেবিলটাতে দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো তন্ময়দা ও ঈশানিদি। ওরা কি যেন আলোচনা করতে করতে ক্যান্টিনে ঢুকেছিল। চেয়ারে বসেই ঈশানিদি বলল কথায় বলে না 'দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। তন্ময়দা শুনেই ভীষণভাবে রিয়্যাক্ট করে বলল তোর কথা মানছি কিন্তু শেষে যদি 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' এর অবস্থা হয় তখন কি করবি? ঈশানিদি সেদিন কোন উত্তর দিতে পারেনি। ওদের এই বিতর্ক এর মীমাংসা কিভাবে হয়েছিল অজয় তা জানে না। তবে দ্বন্দ্বের চোরাস্রোত বয়ে গিয়েছিল অজয় এর মধ্যে। ঔচিত্যবোধ এর টানাপোড়েন তখন কুরে কুরে খেয়েছিল তাকে।

কিছুক্ষণ পরেই পার্কটা চলে যাবে বাচ্চাদের আর তাদের মায়েদের দখলে। কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ তাদের দৈনন্দিন মুক্তবায়ু সেবনের পিপাসা নিয়ে জমায়েত হবে পার্কে। মুক্ত বায়ু সেবনের সঙ্গে সুস্থ থাকার রসদও জুটিয়ে নেবে অজয়। সেখানে নিজেকে নিতান্তই বেমানান ও অগত্যা গাত্রোত্থান শ্রেয় বিবেচনা করে বেরিয়ে পড়ল পার্ক থেকে। অনিচ্ছুক মনটাকে সঙ্গী করে অজয় পা বাড়ালো বাড়ির দিকে। ভাবল, ফেরার পথে একটু চা খেয়ে নেবে। দু চার পা এগুতেই স্কুলের বাংলার শিক্ষক মহিতোষবাবুর সামনে পড়লে অজয়। খুবই সাধাসিধে, স্পষ্টবাদী মানুষ এই মহিতোষবাবু। স্কুলে এক ডাকে ছাত্ররা সবাই ওকে ব্যাকরণ স্যার বলে চেনে। ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এত সুন্দরভাবে উনি পড়াতেন যে বাড়িতে এসে আর বই পড়তে হত না। ছাত্ররা তাই ওনার নাম দিয়েছিল ব্যাকরণ স্যার। সামনাসামনি হতেই অজয় স্যারকে ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। প্রত্যুত্তরে স্যার অজয়ের কাছে জানতে চাইলেন অজয় এখন কি করছে। অজয় বলল, 'মাস্টার ডিগ্রী কমপ্লিট করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বসছি সঙ্গে স্পোকেন ইংলিশ কোচিং নিচ্ছি'। শুনে স্যার বললেন, গো অ্যাহেড মাই সন, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন'। শ্রদ্ধায় চোখের জল এসে গেল অজয়ের। মনে মনে ভাবল স্যার এখনও ঠিক তেমনটি রয়েছেন, একটুও বদলাননি। এগিয়ে চলল অজয়। মনে পড়তে লাগলো স্কুললাইফের সেই দিনগুলোর কথা। মনে পড়ে গেল স্যারের সেই প্রবাদ প্রবচন পড়ানোর দিনগুলোর কথা। স্যার পড়াতেন 'দুষ্ট বলদ এর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো', 'অধিকন্তু ন দোষায়', 'যে শুয়ে থাকে তার ভাগ্য শুয়ে থাকে', 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট', 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল', 'অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী', 'শূন্য কলসির শব্দ বেশি', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', আরো কত কি! স্যার যখন পড়াতেন তখন সবগুলোকে কত সহজ সরল জেনারেলাইজেশন মনে হতো। পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মানুষকে এগুলো ব্যবহার করতে অজয় দেখেছে, কিন্তু এগুলোর বৈপরীত্য অজয়ের মনকে মাঝেমাঝেই নাড়া দেয়। সে মেলাতে পারে না 'অধিকন্তু ন দোষায়' আর 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' প্রবাদ দুটোকে। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হয় তবে 'অধিকন্তু ন দোষায়' কীভাবে সম্ভব? অজয় দেখেছে একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে পরস্পরবিরোধী প্রবাদগুলোকে ব্যবহার করে। এসব দেখতে দেখতে অজয়ের মনে হয় মানুষ বোধহয় বড্ড বেশি সুবিধেবাদী, তাই যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে, আর ভাবে এগুলোই তাদের চলার পথে এক একটি অবলম্বন, যা নিয়ে মানুষ নিজের কাজের বা আচরণে সমর্থনে এক একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে পারে। কবে থেকে, কেন, কীভাবে অজয়ের চিন্তাভাবনা এমন ভিন্ন স্রোতে বইছে তা অজয় নিজেও জানেনা। এইটুকু সে জানে, প্রবাদগুলো মানুষের প্রয়োজনে মানুষই সৃষ্টি করেছে।

দুচোখে সমুদ্র

ড. লিপিকা বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধান
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

আমার দুচোখ ভরা একটি সমুদ্র
যেখানে জল, জল আর জল
ঢেউ আর ঢেউয়ের মালা,
আকাশ ছোঁয়া জলরাশি
হারিয়ে যাওয়ার বিস্তৃত বালুচর।
অগাধ জলরাশি থেকে উঠে আসা
বিরাট এক সূর্য।

আমার দুচোখ ভরা একটি সমুদ্র
শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকা
কত না স্বপ্নের জাল বোনা
হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেজে ওঠা কল্লোল
যা যুগ থেকে যুগান্তের না বলা কথা
ধ্বনিত হয় উদাসী হাওয়ার সাথে
না পাওয়ার সুখস্মৃতি জাগে
হারিয়ে যাবার উন্মাদনায়।

আমার দুচোখ ভরা একটি সমুদ্র
যেখানে শূন্যতা, শূন্যতা আর শূন্যতা
নীল আরও গাঢ় নীল
নীল আর শূন্যতা মিলে এক মায়াবী জগৎ
যেখানে অপূর্ব এক খেলা চলে
যা অবিরাম দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যায়
পাড়ি জমায় অন্য এক নতুন দেশে।

[অণুগল্প]

আঘাত

সহদেব দাস
অতিথি অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ছেলে শহরে পড়াশুনা করে। বেশ মেধাবী। বয়স বাড়লেও চাকরিটা জোটাতে পারেনি। মধ্যবিত্ত পরিবার। হীনমন্যতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে দিনদিন। দীর্ঘ প্রেমের আবহে মশগুল। উভয়েই চাকরির পরীক্ষায় বসল। মেয়েটির চাকরি পাওয়ার সাথে সাথে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অঙ্গীকার করল। রাজেশ তন্দ্রাকে হারানোর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বলল— 'তুমি পিয়ালীর মত চাকরি পেয়ে বদলে যাবে না তো?' তন্দ্রার উত্তর— 'আমি সবার মত নই'। চাকরি পাওয়ার আবেগ-উচ্ছ্বাস কিছুটা ফ্যাকাসে হওয়ার পর তন্দ্রা রাজেশের ফোন তৎক্ষণাৎ রিসিভ করতে চাইল না। কিছুদিন নানা টালবাহানার পর তন্দ্রা একদিন ফোনের ওপার থেকে দ্বিধাহীনভাবে উত্তর দিল— 'আমি সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছাতে তোকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছি, তুই আমাকে আর ফোন করবি না'। তবুও রাজেশ হাল ছাড়লো না। হঠাৎ একদিন ফোনে পুরুষ কণ্ঠে উত্তর এল— 'তুমি আর ওকে ফোন করো না, তোমার কল ওর ফোনে বেজে উঠলে ও কেমন আৎকে ওঠে। তাছাড়া আমরা দুজন খুব শীঘ্রই বিয়েও করছি'। তারপর থেকে রাজেশ আর কল

করেনি। মিথ্যার আশ্রয় এবং নাটকীয়তার মাধ্যমে ওরা যেভাবে আঘাত ও অপমান করল রাজেশ তা সহ্য করতে পারল না। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা চাবুক কষাতে লাগল— পরিবারের দারিদ্রতা, নিজের বেকারত্ব, প্রেমে প্রত্যাঘাত, পরিজনদের লাঞ্ছনা। রাতে ঘুমোতে পারল না। দুষ্কৃতীর সংসর্গে পড়ল। অনেক টাকার অফার পেল। ঠিক দুপুর একটায় মন্দিরে বোম ফেলতে হবে। সকলের নজর এড়িয়ে বোম পড়ল। বিকট শব্দ। বাবার ফোন এলো— 'বাবু তুই কোথায় আছিস? তোকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। শোন তোর মা আজ তোর কাছে যাচ্ছে। যাওয়ার পথে মন্দিরে পুজো দেবে। এতোক্ষণে হয়তো পুজো দিয়েও ফেলেছে। তুই তোর মার কাছে একবার যা'। রাজেশ ঘামে ভিজে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে facebook খুলে খবর দেখল। আতঙ্কবাদীর বোমাতে ৫১ জনের মৃত্যু। এক মহিলার প্রসাদের বাক্সে লেখা ছিল— পুত্র রাজেশ চ্যাটার্জী, শাণ্ডিল্য গোত্র, গ্রাম বিজয়নগর। রাজেশের কানে বোমার থেকেও গভীর শব্দ আঘাত করল— 'বাবু তুই ফিরে আয়'। রাজেশকে আর কোন দিন মন্দিরের আশপাশ থেকে বাড়ি ফেরাতে পারল না।

তবুও সবই সেই আদিম যুগ থেকেই কী নয়???

চক্র

লোকনাথ সাহা
অতিথি ভাষক,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

মাথার ওপর পূর্ণিমা চাঁদ,
সাগর পাড়ে একাকী নিরালায় আমি...
কিছুটা মনে পড়ে, কোন সেই আদিম যুগ থেকে
চাঁদ আর সূর্যের কীসব টানেই নাকি জোয়ার আর ভাটা...
বিজ্ঞান, ভূ-গোল নাকি ইতিহাস শেখায় সে কথা জানি না আমি
ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক
এমনিভাবেই তো আমরা ভুলে গিয়েছি
তপোবনের শিক্ষা, মানবতার দীক্ষা...
দেখছি ঢেউগুলি কীভাবে মাথাকুটে মরছে পাথর ঘর্ষণে,
ঠিক যেভাবে মরছে নিয়তই কত স্বপ্ন, কত আশা, কত
ভালোবাসা...
সঠিকভাবে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে
কত সম্ভবনাময় পুষ্প...
প্রকৃতি তবুও চলে তার আপন গতিতেই, কোনো কিছুর
তোয়াক্কা না করেই...
ঝড়ের বেগে বয়ে আসা তীব্র স্রোতকে ভেঙে দেবার শক্তি যে
প্রকৃতির,
দীপ্তমান পূর্ণিমা চাঁদের ওপরেও নিয়ে আসে
অমাবস্যার ঘোরতর অন্ধকার।
মাঝে মাঝে প্রকৃতির বুকে বজ্রপাত,
তুষারঝটিকা, মেঘের হুঙ্কার আসে ঠিকই,

ছায়া

ঊষা প্রসন্ন মন্ডল
অতিথি অধ্যাপক,
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বিষণ্ণ মনের অলিতে গলিতে
নেশা ছড়ায়
ছবি আর ছায়ায়
দূর থেকে দূরে
অন্তিম পথের কিনারায়
আজও হাতছানি দেয়
স্মৃতির নরম পাতায়
প্রতিচ্ছবি হাসে
পথ চেয়ে বসে
বিপন্ন কারিগর!
হৃদয়ের স্পন্দন থমকে দাঁড়ায়
হঠাৎ ঝড়ের দুরাশায়
ধ্বংসের পাড়ে
মুক্তির ভয়াল আনন্দে
মুক্তি নেই মুক্তি নেই
ছবি আর ছায়ায়।

মজা নদীর উপাখ্যান

ঊষা প্রসন্ন মন্ডল
অতিথি অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

একদিন স্নিগ্ধ ঢেউ-এ খেলে যেত
তার ভরা সংসার
একদিন উতলা মাঝিরা পারাপার করত
তার নবা যৌবন
একদিন বুকভরা সম্পদে সে ঘরের লক্ষ্মী
...
গ্রামের হৃদয়জুড়ে আঁকাবাঁকা পথখানি
শিরা উপশিরার মতো বয়ে চলেছে
তার নীচে জীবন্ত কবরে আজও আছি
পলি জমে জমে মানুষের চলার স্রোতে
কঠিন পাথরে পরিণত হয়ে, আজও আছি
শক্ত ঢেলার নীচে নরম হৃদয়খানিতে আজও আছি
শত লাঙ্গলের আছড়ে উৎপন্ন ফসল, ফসলে আজও আছি
...
কেউ যদি কখনও খুঁজে বার করে, আজও আশায়
ব্রহ্মাণ্ড ফাঁক হয়ে প্রাণ যদি বেরিয়ে আসে,
আজও আশায়
...
আশায় আশায় দিনগুনি
নিরাশার রাতগুনি
অন্তহীন গোনা হিসাবে গরমিল।
...
একদিন স্নিগ্ধ ঢেউ-এ খেলে যেত
আমার ভরা সংসার
একদিন উতলা মাঝিরা পারাপার করত
আমার তখন নবা যৌবন
একদিন বুকভরা সম্পদে আমি ঘরের লক্ষ্মী।

প্রক্ষেপ

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

সাপের মুখে ব্যাঙের আর্ত ধ্বনি শুনে হঠাৎ থেমে যায় রুদ্র। দু'দিন ধরে মাথায় চাগাড় দিচ্ছে কয়েকটি শব্দ— অস্তিত্ব। বিপন্নতা। সংশয়। সংকট। উত্তরণ। তার মনে হল বইয়ের এই বিমূর্ত শব্দগুলির মূর্ত রূপের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল এই দৃশ্যটি। বহুদিন আগে University এর পাঠ শেষ করা রুদ্র মাঝি একটা লাঠি নিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করে একদিকে ব্যাঙটির জীবন দান করল আর অন্যদিকে সাপটিকে অভুক্ত রাখল। তাই স্বগত উক্তির স্বরে রুদ্র বলে ওঠে— 'আজব জায়গা এই পৃথিবীটা। এখানে শোষক আর শোষিত, ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীন, ধর্মান্ধ আর নাস্তিক, সনাতনীয় সংস্কার আর উত্তর আধুনিকতার আশ্চর্যরকম মেলবন্ধনের ভারসাম্যে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। অবশ্য এইসব বিষয় নিয়ে ইংরেজির শিক্ষিকা মৌপ্রিয়ার সঙ্গে রুদ্র'র কম তর্ক হয়নি। সম্প্রতি তাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি তর্কের কিছুটা পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি। স্থান— কলেজ স্ট্রীট বই বাজার। বিষয়— সমসাময়িক মানসিকতা, জীবনচর্চা ও চর্যা, আর আত্মপরিচয়।

মৌপ্রিয়া: তুমি আমাকে ভালোবাসো, রুদ্র?

রুদ্র: বাসি।
মৌপ্রিয়া: কতটা?
রুদ্র: অনেকটা...
মৌপ্রিয়া: তাহলে প্লিজ, তুমি আমাদের ভালোবাসার মাঝে এসব আদর্শবাদের সংস্কার এনো না।
রুদ্র: দেখো সব কিছুরই একটা ভিত থাকে, Basic Principle থাকে। তাই আমার মতে আমাদের ভালোবাসারও একটা ভিত দরকার— সনাতনীয় আদর্শবাদের একটা শক্ত ভিত। অবশ্যই সংস্কার থাকবে তবে তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে শুভবোধ।
মৌপ্রিয়া: তুমি কী বলতে চাইছো? তুমি কি মনে কর আমার কোনো ভিত নেই? কোন শুভ চিন্তা নেই? বিশ্বাস করো তোমাকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হয়। চিন্তা হয় তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে। কী এক উত্তরণের নেশায় দিনের পর দিন দূরত্ব বাড়াচ্ছো সম্পর্কের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে, সুন্দর ভবিষ্যতের সঙ্গে!
রুদ্র: ঠিক-ই বলেছো। দূরত্ব বাড়ছে ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে। ফলে রুচির সঙ্গে সত্তার সংঘাত অনিবার্য হচ্ছে। তবে বর্তমানে আমি ব্যক্তি থেকে সমষ্টির নিকটবর্তী অনুভব করছি।
রুদ্র: আর সময়ের কথা বলছো? নষ্ট সময়ের থেকে দূরে থাকা ভালো।
মৌপ্রিয়া: আর সম্পর্কের থেকে? তোমার কি মনে হচ্ছে না আমার থেকে দূরে দূরে থেকে তুমি পলায়নবাদী মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছো? আর তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ? এর উপর দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু অনেক কিছু।
রুদ্র: এই এতক্ষণ পর একটা দামী কথা বললে মিস মৌপ্রিয়া মুখার্জী। ভালো বাসা তৈরি না হলে যে ভালোবাসা থাকে না তা আমি বুঝি। আর আমি এও বুঝি, আমাকে লড়তে হবে তোমার কাস্টের সঙ্গে, তোমার status এর সঙ্গে, তোমাদের ভাষাগত আধিপত্যের সঙ্গে। আমি পালাচ্ছি না। পালাব আর কোথায়? এই পৃথিবী এক আজব জায়গা।
রুদ্র: পৃথিবীর যেকোনো জায়গায় এই একই সমস্যা বিরাজমান। আমার মনে হয় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভালোবাসার এটা একটা সীমাবদ্ধতা। ভালোবাসার মাত্রাগত উদারতাকে সংকীর্ণ করে দেয়।

হঠাৎ হাল্কা বৃষ্টির আবির্ভাবে তারা তর্ক প্রক্রিয়া থামিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সন্ধানে ছুটতে থাকে। এর মধ্যেই ঘটে যায় এক নাটকীয় দৃশ্য। কলেজ স্ট্রীট স্টপেজের চৌরাস্তায় চারদিক থেকে আসতে থাকা ভিড়ের উন্মত্ততা দেখে খোলা রাজপথে থমকে যায় রুদ্র। আত্মপরিচয়ের স্বর, সংকট, বিপন্নতা, সমর্থন, বিরোধিতা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সব যেন চারদিক থেকে মিশে রুদ্রকে যেন একটা বৃত্তের কেন্দ্রে এনে ফেলে। নিরাপদ স্থানে থাকা মৌপ্রিয়ার দৃষ্টি রুদ্র'র হাতে উঁচু করা প্লাকার্ড এর দিকে। প্রেম। প্রীতি। ঐক্য। উত্তরণ। নির্বাণ...

সংরাগ

সুদেব বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

পর্ব - ১

জীবন পরিক্রমায় স্বপ্নীল কর স্পর্শ
বিশ্বাস। ভরসা। সমব্যাথী।
একাকিত্বের বিষণ্ণতায় ভাটা পড়ে,
উদ্বেলিত সুর লহরীতে নিমগ্ন আর্তি।

পঞ্চরসে সিক্ত আকুল পারা
মধুর রসে প্রাণ—
মাধুকরীতে সঞ্চয় করি সঞ্জীবন সুধা। আর
শুদ্ধ প্রেমের জয়গাথা।

জীবনের রসকলিতে সংরাগ কীর্তন
নিরন্তর গড়ি, তোমার-ই নির্বিকল্প প্রতিমা।

পর্ব- ২

ফর্দ মিলিয়ে প্রাত্যহিক দিনযাপনে ক্লান্তি আসে,
পরিনামহীন যাপন অভ্যেস। তবু, ঘটে পৌন:পুনিক আবর্তন
এখন আমার সোনালী দিন-রাত-সকাল-সন্ধ্যা প্রায় অনিশ্চিত।
তবু, 'বউ কথা কও' পাখির ডাকে সম্বিত ফেরে। তখন, চাঁদ দেখি

অন্তপারের সন্ধ্যায় ভেসে আসে বাউলের ক্ষীন উদাসী সুর
জীবনরাগ, পিয়ারাগ আঁকড়ে ধরে শিকড়ে বাঁধতে চায়
নৌকাবিলাস, মাথুর, মানভঞ্জন হয়ে অভিসার হতে পারে।
না হোক,
অন্ততপক্ষে শিকল বাঁধা মনে আনন্দ-অভিসারের সংরাগ কীর্তন হতে পারে।

পর্ব - ৩

সময়ের গর্ভে বীজ বপন করে চাহিদা। তাই ইহকালে,
গল্প খোঁজ করার অন্তহীন প্রয়াস
একদলা সুখের জন্য বদলাতে থাকে মন, প্রাণ, বীক্ষা। সুখ প্রত্যাশী আমি,
কিন্তু বদল আমার ধাতে নেই। তাই পরকালে,
পরমব্রহ্মে লীন হওয়ার বাসনাসুখ।

নষ্ট সময়ের ক্রান্তিকালে—বাস্তব ও কল্পনা
এক মুঠো ঘেন্না থেকে ওষ্ঠে ওষ্ঠ ছোঁয়ানো—নির্মিত হয়
বিরোধাভাস অলংকারের পাঠ আখ্যান।
বিরোধের অবসান হয় জীবন সংরাগে...

পর্ব - ৪

প্রতিকূলতার সঙ্গে অবিরত দ্বন্দ্ব। কবেকার ছড়ানো বীজ
মুক্ত আকাশ, বাতাসে এখন,
ভালোবাসার স্বর্ণ শস্য

দীর্ঘদিন আগে মেঘকে দূত পাঠিয়েছিলাম। মেঘ, বৃষ্টি হয়ে ঝরেছে,
পবনকে পাঠিয়েছিলাম। পবন স্বস্তির বার্তা দিতে পারেনি,
অবশেষে সাদা বেলফুলের সুবাসে মাতোয়ারা প্রিয়া।
পাঠিয়েছিল মৌমাছি
নবান্নের অমৃত স্বাদে, এবার
নীলকণ্ঠ হিরণ্য।

সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি

ড: ত্রিদিব মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

অরণ্য সংস্কৃতি মানুষের অতীব প্রাচীনত্বের নিদর্শন। বনে জঙ্গলে শিকার এবং খাদ্যসংগ্রহ ভিত্তিক যে জীবনযাত্রা মানুষ প্রাথমিক পর্বে সূচনা করেছিল সেই জীবনধারা খুব স্বাভাবিক ভাবেই অরণ্য নির্ভর ছিল। এই অরণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, বৃক্ষরাজির সঙ্গে এরা সত্যি সত্যিই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে এবং নানা আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের মাধ্যমে আজও সেই সম্পর্ক অবিচ্ছিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। অরণ্য এদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে—অরণ্যের বিশাল পরিধির মধ্যে আদিবাসীরা ফুল-ফল-মূল-কন্দ, লতাপাতা, কাঠ সংগ্রহ করে জীবনের প্রাত্যহিক

প্রয়োজন মেটায়। অরন্যের মধ্যে জীবজন্তুর শিকার এবং মধু সংগ্রহ এদের অন্যতম পেশা। অরণ্য বাস্তুসংস্থান (Forest Ecology) এবং অরণ্য সংস্কৃতি (Forest Culture) অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত। কেবল তাই নয়, এরা একে অপরের দ্বারা রূপায়িত হয়েছে। এই অরণ্যভূমির থেকে এদের বিচ্ছেদের অর্থই হল সাংস্কৃতিক বিঘটন (culture disorganization)।

অঞ্চল পরিচিতি

ব্রিটিশ শাসনকালে সুন্দরবন বলতে বোঝানো হত হুগলি এবং মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী এক বিশাল ভূখণ্ড অর্থাৎ বর্তমানে বরিশাল, বাখরগঞ্জ, খুলনা ও অবিভক্ত ২৪ পরগনার প্রায় সমস্ত অঞ্চল নিয়ে। যার আয়তন প্রায় চোদ্দ হাজার বর্গ মাইল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশভাগের ফলে বর্তমানে সুন্দরবনের আয়তন অনেকটা কমে এসেছে। সুন্দরবনের বেশিরভাগটা পড়েছে বাংলাদেশের মধ্যে। উত্তরে বিদ্যাধরী নদীর পূর্বপাড় থেকে ইছামতী-কালিন্দী নদীর পশ্চিম তীর, আর দক্ষিণে পিয়ালি নদীর পূর্বদিক নিয়ে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার, আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত কাকদ্বীপ, সাগর, নামখানা পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, জয়নগর, কুলতলি, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি ও সাগর পর্যন্ত প্রায় ৫৫টি দ্বীপ নিয়ে বর্তমানে সুন্দরবন গঠিত। চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবনের আয়তন ৭. ৯১ হেক্টর।

নামের পরিচিতি

সুন্দরবন নাম কবে থেকে প্রচলিত, তা ইতিহাসে লেখা নেই। প্রচুর 'সুন্দরী' (Heretia Phyron) বা সুঁদরী গাছ এখানে জন্মাত বলেই এই বনভূমিকে বলা হয়েছে সুন্দরবন। কেউ কেউ মনে করেন 'সুন্দরবন' বা 'চন্দ্রদ্বীপবন' থেকে হয়েছে সুন্দরবন। আবার কেউ কেউ মনে করেন চণ্ডভাণ্ড নামে বন্যজাতি থেকে হয়েছে সুন্দরবন। জোয়ারের সময় এই অঞ্চলের নদ-নদী, বনভূমি জলে ডুবে যেত আবার ভাঁটির টানে জেগে উঠত বলেও এই বনাঞ্চলকে বলা হত 'ভাটিদেশ'। সপ্তদশ শতকের পূর্বেও এই নাম প্রচলিত ছিল। অধুনা যে বিস্তৃত অঞ্চল সুন্দরবন নামে পরিচিত একদা সেই ভূমিতেই গড়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতা।[১] এই জনবসতি এলাকা এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে একটা অদৃশ্য নিগুঢ় সম্পর্ক লুকিয়ে আছে। দক্ষিণের সমুদ্রের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ভয়ঙ্কর ঝড় ঝঞ্ঝার হাত থেকে বসতি এলাকাগুলোকে রক্ষা করে রেখেছে।

সুন্দরবন অঞ্চলটা কেমন

এঁটেল মাটি, দোআঁশ মাটি, বেলে ও নোনামাটি সমৃদ্ধ জল, কাদা, জঙ্গল ও বাদাবনের দেশ সুন্দরবন। খাল, বিল, খাঁড়ি, নদী, নালা নিয়ে বিচিত্র আকারের প্রায় ৫৫টি দ্বীপনালা বিশাল নদী মোহনা, সাগরবেলা, সৈকতভূমি, চারণভূমি, অভয়ারণ্য, পাখিরালয়, বিশাল বিশাল আবাদি খেত-খামার, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, ছোটো বন্দর, মোকাম, মহর্ষি কপিলমুনির আশ্রম সংলগ্ন মহাতীর্থভূমি গঙ্গাসাগর নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল। যার জলে কুমির, ঘড়িয়াল, হাঙর, কামট, শুশুক, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে পৃথিবী বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, বাঘরাল, বনবিড়াল, বন্যশূকর, বানর, হরিণ, চিতল, শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বিষধর প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের সাপ যেমন রয়েছে তেমনি দেশি ও বিদেশি যাযাবর পাখিরা যা সুন্দরবন অঞ্চলকে আরও ভয়ংকর সুন্দর করেছে।[২]

জনগোষ্ঠী

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ হিন্দু ও মুসলিম এই দুটি সম্প্রদায়ের বেশি। এছাড়া কিছু বৌদ্ধ ও কিছু খ্রিস্টান আছে। মধ্যযুগ জুড়ে দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষীদের অভিবাসন ঘটেছিল এই অঞ্চলে। যেমন মুঘলদের হাতে বারো ভূঁইয়াদের পরাজয়ের পর তাদের আশ্রিত অভিজাতরা আত্মগোপন ও নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিম সুন্দরবন অতিক্রম করে চব্বিশ পরগনার আদি গঙ্গা সংলগ্ন নানা স্থানে বসবাস শুরু করে। আবার একই রকমভাবে বর্গী আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য স্থান থেকেও কিছু উচ্চবর্গীয়দের অভিবাসন ঘটে। এইভাবে চব্বিশ পরগনার ছোটো বড়ো ভূস্বামীদের অধিকাংশ রাজপুর বারুইপুরের রায়, মজিলপুরের দত্ত, মিত্র ও মতিলাল, হরিনাভির দে, মথুরাপুরের সিংহ, বজবজের হালদার ও লক্ষীকান্তপুরের পুততুণ্ড ইত্যাদিরা এসেছিলেন

উত্তর ও পূর্বের জেলাগুলি থেকে। এরা সকলেই ছিলেন উচ্চবর্গীয় কায়স্থ অথবা ব্রাহ্মণ। [৩]

সাধারণ মানুষের অধিকাংশই ছিলেন সামাজিকভাবেই নিম্নবর্গীয় স্তরের। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে সুন্দরবনসহ চব্বিশ পরগনায় মোট ২৬৬ প্রকার জাতির বাস ছিল। মোট জনসংখ্যা ছিল ১০,০৩,১১০। এদের মধ্যে সর্বাধিক ছিল পৌণ্ড্র প্রায় ২২ শতাংশ। দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী কৈবর্তরা ছিল ১৪.৬ শতাংশ, পর্যায়ক্রমে বাগদি ও গোয়ালারা ৮ ও ৬ শতাংশ। চণ্ডাল বা নমঃশূদ্ররা পূর্ব সুন্দরবনে সংখ্যায় অধিক হলেও, এই জেলায় তারা ছিল মাত্র ২ শতাংশ।[৪] তবে W.W. Hunter তাঁর Statistical Account of Sundarban-এ সুন্দরবনাঞ্চলের হিন্দুদের পেশা অনুযায়ী ভাগ করে দেখিয়েছেন। ভাগগুলি এরকম—

১. পৌণ্ড্র বা পোদ— ক) ধেনো পোদ খ) মেছো পোদ— ২. চণ্ডাল বা চাঁড়াল— ৩. নাপিত ৪. কৈবর্ত ৫.কাপালী ৬. জেলিয়া ৭. বাগদী ৮. তিয়র ৯. ধোবা ১০. কাওরা বা কাহার ১১. শুঁড়ি ১২. যুগী বা যোগী ১৩. মুচি ১৪. মালঙ্গী ১৫. মীরশিকারীরা ১৬. সাপুড়ে বেদে ১৭. মঘ বৌদ্ধেরা— মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মূলত তিনটি শ্রেণির- ক) শেখ খ) সৈয়দ গ) পাঠান মুসলমান।

লৌকিক দেবতা

বাংলাদেশের লৌকিক দেবদেবীদের মধ্যে শীতলা, চণ্ডী, কালী, বেহুলা, রাধা এবং উৎসবের মধ্যে গাজন, গম্ভীরা, চড়ক, হোলি ইত্যাদি আর্যের অনার্যীকরণের যথার্থ নিদর্শন। সুতরাং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে, সমাজের নিম্নভূমিতে যে জনগোষ্ঠী বাস করছে তাদের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, পালা-পার্বন, গান-গীতিকা, আচার-অনুষ্ঠান, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই দেশ এবং দেশজ সংস্কৃতির যথার্থ রূপ উদ্ঘাটিত হবে। জাতির মানস ও মননের ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস। ইতিহাসের রাজপথে জনমানুষের পরিচয় মেলে না। জনমানুষের স্বরূপ নিহিত থাকে ইতিহাসের গলিপথে, বাঙালির মানস ইতিহাস ও তার মানস জগতের অন্তঃস্থলে। ড. নীহাররঞ্জন রায় মানুষের সামাজিক জীবন প্রসঙ্গে বলেন, 'মানুষ সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবার প্রেরণায় ও প্রয়োজনে নানা কর্মসূত্রকে আশ্রয় করে এক একটি সমাজ গড়ে তোলে, নিজেরই পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য। ধর্ম, কর্ম, শিল্পকলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতি যেমন এই কর্মসূত্রের অন্তর্গত রাষ্ট্রবন্ধন, বর্ণবন্ধন, গোষ্ঠীবন্ধন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শস্যোৎপাদন, রন্ধনক্রিয়া, আচার-ব্যবহার ছোট বড় তুচ্ছ যত কর্ম, সমস্তই বিশেষ দেশ ও কালের সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন সূত্র বা অঙ্গ, যারা আবার একে অন্যে পারস্পারিক সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে সমাজ দেহকে ধারণ করে রাখে।'[৫] সমাজের এই বিভিন্ন দিকের পরিচয়ই খাঁটি দেশ পরিচয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু বনদেবতা আছেন। যেমন বনবিবি, বনদুর্গা, মনসা, বনকালী, দক্ষিণরায়, কালুরায়, সোনারায়, বদরসাহেব চণ্ডী, বাঘবীর, বনকুমারী, রুদ্রা, সিমি ইত্যাদি।[৬]

পবিত্র কুঞ্জ ছেদন করলে বনদেবতা ক্রুদ্ধ হবেন এটাই তাদের বিশ্বাস। এখানে বনবিবি ও দক্ষিণরায় নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হল—

বনবিবি— বনবিবি ব্যাঘ্র ভীতি দূরকারী মুসলমানি দেবতা। এ দেবতার কাছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই নৈবেদ্য অর্পণ করে। মূর্তির মধ্যে উভয় ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সজনেখালি, নেতাধোপানি, পাথরপ্রতিমা, সমসের নগর, পারঘুমটি প্রভৃতি জায়গায় বনবিবি অনেকটা সরস্বতী মূর্তির মতো। মাথায় বিরাট মুকুট, কাঞ্চন কিংবা হরিদ্রাবর্ণ, সুশ্রীদ্বিভুজা। এর হাতে কোন আশাবারি থাকে না। অন্যত্র এই মূর্তিতে মুসলমান প্রভাব স্পষ্ট। রঙিন লতাপাতা আঁকা ছোটো টুপি, চুল লম্বা বিনুনি করা, মাথায় টিকলি, পরনে ঘাঘরা বা পায়জামা, ওড়না, পায়ে জুতো ও মোজা। কোন কোন মূর্তিতে একটি সন্তান কোলে, লোকবিশ্বাসে এ সন্তানটি দুঃখে। অরণ্যজীবিরা জঙ্গলে ঢোকার আগে এই দেবীর পূজা-অর্চনার আয়োজন করে। বনে প্রবেশের এক সপ্তাহ আগে বাড়ির মহিলারা নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করে। শুদ্ধাচারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে মানত করে। পুজোর সময় মা বনবিবির উদ্দেশ্যে মুরগি ছেড়ে দেওয়া হয়। স্বামী যতদিন জঙ্গলে থাকে ততদিন স্ত্রী হাতের নোয়া, শাঁখা খুলে রাখে, মাথায় সিঁদুর পরে না, ঘরের দরজা খোলা রাখে। প্রধানত

চৈত্র-বৈশাখ কিংবা অগ্রহায়ণ, পৌষ এবং মাঘ মাসেও এ পুজো হয়ে থাকে। পুজোর সময় বনবিবির পালাগান হয়। এই গান দুখের জীবন অবলম্বনে হয়। পালার নাম দেওয়া হয় 'দুখে যাত্রা'[৭]। কবি ওয়াজেদ আলী তার 'বনবিবির বন' নামক কবিতায় লিখেছেন—

প্রতিবছর বোশেখ মাসে মঙ্গলবারে,
দলবেঁধে সব নৌকা নিয়ে আসে বনের ধারে।
বনবিবির নামে তারা সারা দিয়ে যায়,
মোরগ কিংবা মুরগি দিয়ে মানত মেটায়।
বনবিবির জঙ্গলেরই এসব প্রথা আছে,
সোঁদরবনের গেঁও মানুষ এসব নিয়ে বাঁচে
গঙ্গারিডি বাজ্যেত তাই বনবিবির বন,
ভয়াল সবুজ হলেও তা মুগ্ধ করে মন।[৮]

দক্ষিণরায়— দক্ষিণরায় একদিকে যেমন বাঘের দেবতা, অন্যদিকে তেমনি শস্য দেবতা। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় দক্ষিণরায়কে দেখানো হয়েছে অত্যাচারী রাজা এবং বনবিবিকে দেখানো হয়েছে অত্যাচারিত মানুষের রক্ষক হিসেবে। কিন্তু মতবাদ যাইহোক না কেন, জল-জঙ্গলের মানুষ দক্ষিণরায়কে সর্বোপরি বনদেবতা হিসেবে পূজা করে। তিনি হলেন এখানকার লোকদের কাছে লৌকিক দেবতা। এই দেবতার মূর্তি হল ব্যাঘ্রাসীন ও যুদ্ধবেশ, হাতে ঢাল, তলোয়ার, তীরধনুক, কোন মূর্তিতে হাতে মুঙ্গের বন্দুক। যেমন বারুইপুর থানার ধপধপি গ্রামের দক্ষিণরায়ের মন্দিরে দক্ষিণরায়ের হাতে মুঙ্গেরি গাদা বন্দুক দেখা যায়। দক্ষিণরায়ের পুজো উপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও বড় মেলা হয়। যেমন— হাসনাবাদ থানার ভেবিয়া, বারুইপুর থানার ধপধপি, ঢোঁসা, ক্যানিং, গোসাবা, পারঘুমটি, সমসেরনগর, কালীতলা প্রভৃতি জায়গায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের— মৌলে, কাঠুরে, জেলে এছাড়াও অন্যান্য মানুষজন এই দেবতার পূজো করে। পুজোর জন্য খুব বেশি উপাচারের প্রয়োজন হয় না। অল্প কিছু ফলমূল অর্ঘ্য সাজিয়ে পুজো করলেই হয়, অনেক জায়গায় মুরগি বলির প্রচলন আছে। হরিদেবের 'মঙ্গলকাব্যে দক্ষিণরায়' বলেছেন—

আমি তো জঙ্গল রাজা দক্ষিণ ঈশ্বর,
আমার) সেবক বটে হয়তো ধীবর।[১০]

গীতি পালা— সুন্দরবন অঞ্চলে এক ধরনের গীতি পালা প্রচলিত আছে। যা অনেক সময় শ্রোতাদের সামনে পাঁচালী যাত্রার ঢঙে পরিবেশিত হয়। যেমন— জরিনা, সাগরভাসান, রূপবানযাত্রা, রাখাল বন্ধু, রুমনি-ঝুমনি, দুখের বনবাস, রামলীলা ইত্যাদি জনচিত্তকে আলোড়িত করে। এই পালাগুলির লেখক কে তা আজও অজানা। পালাগুলিতে অসংখ্য গানের সমাহার দেখা যায়, যা ধর্ম নিরপেক্ষ উদার মানবীয় রস শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এই যাত্রাপালাগুলিতে ছেলেরা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে। তবে কোথাও কোথাও মেয়েদেরও অংশগ্রহণের কথা জানা যায়। আঞ্চলিক ভাষায় এ যাত্রাপালাগুলি গ্রাম-গঞ্জে পরিবেশিত হত। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত ঢোল, বাঁশি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি। এরা একটি দলে সাত থেকে আটজন থাকত। পালাগান কমপক্ষে দুই-তিন রাত্রি ধরে চলত।[১১]

মন্ত্র তন্ত্রের বিশ্বাসী মানুষ— এই অঞ্চলের মানুষের মন্ত্রতন্ত্রে অগাধ বিশ্বাস ছিল। মন্ত্রতন্ত্র, ধুলোপড়া, জলপড়া, ঠাকুরের পা ধোওয়া জল, ঠাকুরের থানের মাটি খেয়ে কেউ বেঁচে গেছে আবার কেউ অসুখে ভুগে মারাও গেছে। অদৃষ্ট নির্ভর মানুষ। বনে জঙ্গলে মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহার করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করত। এই মন্ত্রগুলির নাম বেশ অদ্ভুত রকমের। যেমন

নৌকাবন্ধ, ঘরবন্ধ, পাড়াবন্ধ, বনে নামা, খিলেন, বাঘবন্দি, জলপড়া, তেলপড়া, হলুদবাণ, সরিষাবাণ, বশকরা, সিঁদুর পরা, পানপড়া, ঝাঁটার কাঠি পড়া ইত্যাদি অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র ছিল। এমনকি শোনা যায় যে, ওই অঞ্চলে চৌষট্টি প্রজাতির সাপ আছে এবং তার জন্য চৌষট্টি প্রকারের সাপের মন্ত্র রয়েছে গুণিনদের কাছে। এমনকি ভূত ছাড়ানোর মন্ত্রের কথাও শোনা যায়। এখানে একটি জলপড়া মন্ত্রের উল্লেখ করা হল—

জল জল জলেশ্বরী গঙ্গা ভাগীরথী
ভগীরথ গঙ্গা মর্ত্যেতে সারথি
হস্তেতে করিয়া জল দিলাম অমুকের গায়ে
অমুকের ঘর ছাড়, দোল ছাড়, বেহালি স্বামীর কোল ছাড়।
আমার এই জলপড়া শিগগির লাগ
কার দোহাই? দেবী মা বনবিবির দোহাই লাগ...[১২]

এরকম অসংখ্য মন্ত্রতন্ত্র এই অঞ্চলের এক শ্রেণির মানুষ যারা গুণিন নামে পরিচিত তাদের কাছ থেকে জানা যায়। যাইহোক সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা সকল রকম আবহাওয়াজনিত প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসে সক্ষম। এর পিছনে কাজ করে তার নিজস্ব সংস্কৃতি। বাস্তু সংস্থান বা Ecology এর প্রকৃতি মানব সমাজে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করে। এই বাস্তু সংস্থানের সঙ্গেই মানুষের আত্মিক সংযোগ এবং সেই সংযোগের ঘাত-প্রতিঘাতে তার ক্রিয়া-বিক্রিয়া এবং কর্মধারা রচিত হয়। সেগুলি সুসামঞ্জস্য বিন্যাস-ই হল সংস্কৃতি।

তথ্যসূত্রঃ

১. দুলাল চৌধুরী, 'সুন্দরবনের বনদেবতা', গোকুল চন্দ্র দাস (সম্পা.): ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৪৯।

২. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, 'সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ', রিড়ার সার্ভিস, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩৮।

৩. গোকুলচন্দ্র দাস, 'উনিশ শতকের চব্বিশ পরগনা: সমাজ ও অর্থনীতির রূপান্তর', গোকুল চন্দ্র দাস (সম্পা.): ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩১।

৪. Resely H. H, 'Tribes and Caste of Bengal', Vol. 1, Kolkata, 1891, P.183.

৫. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, 'সুন্দরবনের অর্থনীতি জন সংস্কৃতি ও পরিবেশ', রিডার সার্ভিস, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭,

৬. তদেব, পৃষ্ঠা ১৪৩

৭. সনৎকুমার নস্কর, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি ভূগোল', গোকুল চন্দ্র দাস (সম্পা): ২৪ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা, প্রোসেসিভ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠ ২৪১-২৪৩।

৮. ওয়াজেদ আলী, 'বনবিবির বন' (লোকমুখে প্রচলিত)

৯. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, 'সুন্দরবনের অর্থনীতি জন সংস্কৃতি ও পরিবেশ', রিডার সার্ভিস, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১০৯-১১৪।

১০. হরি দেব, 'রায়মঙ্গল কাব্য' (লোকমুখে প্রচলিত)

১১. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, 'সুন্দরবনের অর্থনীতি জন সংস্কৃতি ও পরিবেশ', 'গীতিপালা', রিডার সার্ভিস, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৫৩।

১২. রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, 'সুন্দরবনের অর্থনীতি জন সংস্কৃতি ও পরিবেশ', 'মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ' রিডার সার্ভিস, কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৪।

বীরত্বের সম্মান

আকাশ মন্ডল

একটি আয়না,
মুখ দেখে গোটা পরিবার।
সংবাদ আসলে,
রাইফেল কাঁধে,
বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে।
মন যে মানেনা তার,
তবুও মধ্যরাতে থাকতে হয়,
তাকে সীমান্তপার।
শুধুমাত্র একটি ছবি,
তারই পরিবার।

কেটে যায় দিন,
কেটে যায় রাত।
এভাবেই চলে যায়...
বছর ও মাস।

হঠাৎ!
সংবাদ পায়,
সেই ছবিতে আঁকাপরিবার,
পরমবীরচক্র পেয়েছে সে আজ।
তারপর...
একে একে ওঠে স্লোগান...
কতনা এই বীরত্বের সন্মান।
ফল এই যে,
কফিনবন্দি সে আজ।
ক্রন্দনরতা আজ তার পরিবার।

এটাই কি বুঝি বীরত্বের সন্মান??

নিঃসঙ্গতায় রবীন্দ্রনাথ - তিনটি গানের বিশ্লেষণ

ড. প্রতিটি প্রামানিক (দে)
সংগীত বিভাগ

মনের ভাবকে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা কথা বলি। সেই থেকে ভাষার উৎপত্তি। আমাদের আটপৌরে কথাগুলি বেশিরভাগই হয় কাজের কথা। কিন্তু এরই মধ্যে কিছু কিছু কথা আমরা বলি যেগুলি একটু বিশেষ ধরনের, যা আমাদের মনের গভীরতা থেকে উঠে আসে, আমাদের কোনো বিশেষ উপলব্ধিকে ব্যক্ত করে, কোন নিবিড় অনুভব কে প্রকাশ করে। এই কথাগুলি সহজে হারিয়ে যায় না, এরা থেকে যায় মনের গভীরে কোন বিশেষ জায়গায়। এইসব বিশেষ কথার উৎসে যদি আমরা পৌঁছতে চাই; আমরা এসে দাঁড়াই অন্তরমহলে। অনুভবের এলাকা সেখানে কাব্য ও সংগীতের ভাবময় আকাশ ও আবেগের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত। রবীন্দ্রনাথের গানের অভিকর্ষ প্রধানতঃ ভাবের দিকে, ভাবতেই তার প্রাণ, তার উপাদান, তার নিহিত গুরু রহস্য। সেই ভাব নান্দনিক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে আঘাত সহ্য করেছেন বারবার। সেইসঙ্গে তার সুবিশাল পথভ্রমণে নিঃসঙ্গতাও অর্জন করেছেন আমৃত্যু। ১৩ মে ১৯৪১ সালে রচিত কবিতা—

"চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।।"

এই নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে কবির সৃষ্টির ডালি আরো সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। তাঁর যে রচনাগুলি আমরা পাই তার বেশিরভাগই গানের মাধ্যমে জীবনদেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করেছেন কবি। ভাবতে অবাক লাগে এই নিঃসঙ্গ, বিপন্ন মানুষটির দুর্বার মনের জোর। সমস্তরকম বিপর্যয় আর বিপন্নতার মধ্যে অমোঘ আয়ুধ ছিল তাঁর অব্যর্থ কোষে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংগীত রচনার মধ্য দিয়ে যে ভাব প্রকাশ করেছেন তার বিভিন্ন ধারা বর্তমান। গানগুলিকে বার বার পাঠ করা সত্ত্বেও তাকে সঠিক পর্যায়ভুক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এইখানেই তিনি অনন্য। তবে বিভিন্ন সময়ের রচনাকাল অনুযায়ী গানগুলি দেখলে বোঝা যায় সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গানগুলির মধ্যে যথাযথভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রেম পর্যায়ের একটি গান উল্লেখ করা যেতে পারে—

"যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম
কে যে আমায় কাঁদায় আমি কি জানি তার নাম।"

—এই জবানিতে কবি প্রথমে শনাক্ত করতে পারেননি এ ব্যথার কোনো নিশ্চিত উৎসভূমি বা স্পষ্ট কারণ। অনির্দেশ্য এই ব্যথার উৎস জানতে তিনি প্রয়াসী। তবে এটুকু বোঝা যায় যে এ ব্যথা শারীরিক নয়। কথকের মধ্যে যেন এক সংশয়, বিপন্নতাবোধও কাজ করে। সবকিছুই যেন তাঁর দেওয়া হয়ে গেছে, বিকিয়ে গেছে নিজের সবটুকু। কিন্তু প্রতিদান তিনি পাননি। অনুমান করা যায়, এটাই হয়ত তাঁর কান্নার কারণ, যার কাছে নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছেন, হয়তো সেই নিশ্চয়তা নেই। কবি যেন ভেতরে ভেতরে আমাদের জানাতে চেয়েছেন দিয়ে যাওয়াটাই সত্য। বস্তুগত প্রাপ্তিটাই সব নয়, আর কিছুক্ষেত্রে না পাওয়াটাই বড় প্রাপ্তি।

আরেকটি প্রেম পর্যায়ের গান—

"শ্রাবণের পবনে আকুল বিষন্ন সন্ধ্যায়

সাথীহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূর কালের অরণ্যছায়াতলে।।"

এই গানটির যেমন বাণী তেমন সুর, কোন চাঞ্চল্য নেই। শ্রাবণের দিনে যেখানে সাথীকে সবসময় সঙ্গে রাখতে ইচ্ছে করে সেখানে কবি সাথীহারা যন্ত্রণায় কাতর, মলিন, প্রবাসী পাখির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন নিজেকে। তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে ঘরে ফেরার জন্য। প্রিয়ার আঁচলের ছায়াতলে থাকার জন্য অধীর আগ্রহে রয়েছেন কবি। এক অকুণ্ঠ পরিসরে কুণ্ঠীতা নারীকে প্রত্যক্ষ করেছেন এই গানের মধ্য দিয়ে। কবির মনেও এক কুণ্ঠাবোধ কাজ করেছে। যে আজও যদি তিনি ফিরে যান তাহলে সেই বিরহী হিয়া আছে কিনা, যদিও বা তাকে তবে কবি যে গানের মধ্যে দিয়ে নিরব সাধনায় মগ্ন রয়েছেন, কাঙ্খিত হয়ে রয়েছেন, সেই সাধনায় তিনি কি সাড়া দেবেন? অন্তরায় তিনটি লাইনের মধ্যে এইভাবে খুব স্পষ্ট। সঞ্চারীতে কবি বলেছেন—

"হায় জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে জানি সে নাই নাই
তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়।"

হঠাৎ যাত্রীগণ তীর্থ দর্শনের যেমন উন্মুখ হয়ে যান তাঁর আরাধ্য দেবতাকে একবারমাত্র দর্শনের জন্য এবং সেখানে গিয়ে যদি দেবতাকে দর্শন করতে না পারেন, তাঁর অভিষ্ট দেবতা যদি সেই মন্দিরের না থাকেন যেভাবে তাঁরা ভেঙে পড়েন, সর্বহারা হয়ে যায়, কবিও তাঁর প্রিয়তমাকে 'জীর্ণ নীড়ে' না পেয়ে সর্বহৃত হয়ে পড়েন। তিনি জানেন যে তাঁর প্রিয়তমা সেখানে নেই, চারিদিকে শূন্য, হাহারবে পরিপূর্ণ, তবুও তাঁর হৃদয় তাকে সেই আশ্রয়ে যেতে বারবার প্রক্ষেপণ করে। রিক্ত ভুবনে তিনি বারবার ছুটে যেতে চান।

১৯৩৬ সালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

"অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানব প্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায়, আমাদের অন্তবাসিনী রাধাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করেছে প্রতিনিয়ত। তপ্ত আমাকে বিস্মিত করেছে।... আমি মানি
রসস্বরূপকে, যাঁর পরানন্দের মাত্রা জীবে জীবে, আমি সেই আনন্দকে উপলব্ধি করতে চাই বিশ্বের সর্বত্র।..."

প্রেম পর্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান -

"দিনের পরে দিন যে গেল আধার ঘরে
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে।।"

কীর্তন অঙ্গের গানটির মধ্যে দিয়ে কবির নিঃসঙ্গতাবোধ যেন আরও প্রগাঢ় ভাবে ফুটে উঠেছে। এই গানের বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির মানুষীসত্ত্বার অনুভূতির বাঙময় প্রকাশ। চিরন্তন অসন্তোষ মানুষকে ছুটি নিয়ে বেড়ায়। যে সুখ মানুষ খুঁজে তা নিতান্তই পার্থিব, সুখ কি, কিসে সুখ আসে তার অন্বেষণেই মানুষ ব্যস্ত থাকে অথচ নিভৃতে কখন যে সুখের মুহূর্তটি বয়ে যায় সে জানতেও পারেনা, আর যদি বা সনাক্ত করে ফেলতে পারে, তবু যা পেয়েছে তাতে সন্তুষ্ট হয় না। কবির ভাষায়—

"... ফুলের সাজি মন জন্য আজি
ব্যাথার হারে গাথব তারে, রাখব চরণ পরে।"

যে ফুল দিয়ে ডালা ভরে গেছে তাকে মালাকরে প্রিয়ের চরণে তাকে উৎসর্গ করা। যে মালা করে প্রিয়ের চরণে তাকে উৎসর্গ করা। যে মালা গলায় দিতে পারা যেত তাকে পূজার আসনে রেখে তার চরম সাজানো, এখানেই রবীন্দ্রনাথের একাত্মতা প্রকাশ পায়।

কবি জানেন তিনি ক্ষুদ্র হতে পারেন কিন্তু তুচ্ছ নন। ভক্ত হৃদয় যে আকুলতা, যে দিন গোনা সেই আকুলতার দিক দিয়ে বোধহয় ভূমি সমান হয়ে যান। ভক্ত যখনই উপলব্ধি করেন, তার হৃদি-সিংহাসনে তার প্রিয়তম নিত্য জাগরিত থাকে। এই গানটিও যেন তার অপেক্ষার গান। দোসরজনের জন্য অপেক্ষা। ঈশ্বর কি করে ভক্তের দোসর হতে পারেন। না পাওয়ার নিদারুণ হতাশায় পথ চাওয়া সুর কেঁদে মরছে। আর তারপরই কথক নিজের কথা বলেন—

"প্রাণের কথা ভাষা হারায়
চোখের জল ঝরে।"

এমনকি তাঁর অভিজ্ঞতার সাথে যেন আমাদেরও

অভিজ্ঞতা মিলে যায় - দারুন বরষায় একলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে যখন দেখা যায় মেঘনিবিড় আকাশ থেকে অবিরল ধারায় ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা, বৃষ্টির শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ তখন কানে আসে না। আমাদেরও মন তখন ভেতরে ভেতরে উদাস হয়, কখনও কখনও গলার কাছে কান্না আটকে থাকে।

শুধুমাত্র এই তিনটি গান নয়, এরকম অসংখ্য গান আছে যার মধ্যে দিয়ে কবি তাঁর কিছু নিঃসঙ্গ মুহূর্ত ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন— রূপকড়া তালে নিবন্ধ প্রেম পর্যায়ের "কেন সারাদিন ধীরে ধীরে" গানটি। এই গানটির ছন্দ ও তাল বেশ নতুন ধরনের। সারাদিন একা একা বালু নিয়ে খেলা। হয়তো পথে কেউ বসে আছে তার জন্য, ফাগুন বাতাসে কুসুমের সুবাসে হঠাৎ করেই মন উদাস হয়ে যায়। গানটির সুরমাধুর্যের মধ্যে দিয়েই গানটিই ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ, দিলীপকুমার রায়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন—

"আমি তো আমার গানের মধ্যে কোন ফাঁক রাখিনি যে তোমরা ভরাট করবে, আমাদের জীবনের উপর এই

গান সর্বশক্তিমান হয়ে বসে পড়েছে, আমাদের উৎসবে-বেদনায়-সুখে-দুঃখে, আমাদের ম্রিয়মানতায় আমাদের

নিঃসঙ্গতায়।"

এই কারণেই তিনি আমাদের প্রাণের আসনের সবটুকু স্থান দখল করে বসে আছে নিজের অজান্তেই।

রাধারানী

মিজানুর মণ্ডল
অশিক্ষক কর্মচারী

রাধা। রা... ধা। ও রাধা চল বাড়ি যাই, না আমি এখন রান্নাবাটি খেলিব তারপর আরও অনেক কিছু খেলা বাকি আছে যে। রাধা শোন মা যাও বনমালির সাথে বাড়ি যাও ওসব পরে খেলিও। কেন জেঠিমা আমি ওনার সাথে যাব? আরে শোন মা ও অমন বলে না উনি যে তোর স্বোয়ামী— দেখো স্বোয়ামী, কি করে হইল জ্যাঠাইমা দেখ সুলেখা দেখ তোর মেয়ে কী বলে? শোন রাধা বনমালী সাথে যে তোর একটু আগে বিবাহ হয়েছে। কিন্তু বিবাহ সে কিরূপে হইল আমি তো পুতুল বর খেলার জন্য বনমালী বাবুর গলাতে মালা দিয়াছি। হ্যাঁ দিয়াছিস বটে শোন মা ওটাই তোর বরমাল্য যা তুমি বনমালী বাবুকে পরাইয়াছো। যাও এখন তুমি বনমালীবাবুর সাথে তোমার নিজের বাড়ি জীবনপুর যাও। তারপর রান্নাবাটি, পুতুল বর আরো অনেক খেলা খেলিস। অবশেষে শত আপত্তি সত্ত্বেও সাত বছরের রাধারাণীকে বনমালী রায়ের সঙ্গে জীবনপুর আসতেই হইল এবং শত আপত্তির পরেও তাকে সংসারের হাড়িকাঠে গলা দিতে হইল কয়েক বছরের মধ্যে বনমালী এবং রাধারানী রায়ের দুই পুত্র রবি রায়, সুজন রায় এবং দুই কন্যা চন্দ্রা এবং সুপর্ণা জন্ম নিল। এর অনতিকাল পরে দেশভাগের পটভূমিকায় সমস্ত কিছু ছেড়ে আস্তানা গাড়তে হয় এদেশের মির্জাপুর গ্রামে। এই গ্রামে হিন্দু মুসলমানের মিলিঝুলি সংস্কৃতির মধ্যে তাদের ভালই চলছিল কিন্তু বাঁধ সাধলো হঠাৎ রাধার স্বামী বনমালীর ইহলোক ত্যাগ করাতে। এরপর অষ্টাদশী বিধবা রাধার পক্ষে দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে ভরণপোষণ করা বেশ কঠিন হয়ে উঠল । কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইতে লাগিল। তবে অষ্টাদশী রাধারানী দুই পুত্রকে যথাসম্ভব স্কুলের পড়াইতে লাগিলেন অবশেষে পিঠোপিঠি দুই দাদাভাই ম্যাট্রিক পাশ দিয়া চাকরির সন্ধান করিতে লাগিলেন এবং পুলিশ বিভাগের চাকুরী জোগাড় করিয়া বড় জন রাজধানী এবং ছোটজন বিহারে চলিয়া গেলেন এবং বিধবা মা রাধারাণীকে ভরসা জোগাইলেন যে কিছুকাল পরে তারা মাকে নিজের কাছে আনিবে। রাধারানীও আশায় বুক বাঁধিয়া রইলেন যে রবি ও সুজন ফিরিয়া আসিয়া তাদের বোনের ধুমধাম করে বিবাহ দিয়া আমাকে অনেক খাতির-যত্নে রাখিবার তাহারা নিয়ে যাইবে। এবং বৎসর তিনেক পরে ছোট ছেলে সুজন রায়

মাকে একটি পত্র মারফত জানাইল যে সে এক বিহারী বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখে শান্তিতে আছে। আপাতত কয়েক বছর সে গ্রামের বাড়িতে আসবে না তবে সে এটা ... রে সে বাড়িতে আসিবে। এর কিছুদিন পরে রাধারানীর এক কন্যা চন্দ্রা হঠাৎ তিনদিনের জ্ব... া করিয়াও হাকিম কবিরাজ তাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। আর অপর কণ্যা সুপর্ণা এক রাজ... ্যাগ করিল বরাবরের মত।

এমত অবস্থায় রাধারানীর চুলে পাক ধরি... ক কন্যাকে হারাইয়া গভীর দুঃখে থাকিতে লাগিল তেমনই তিন সন্তানের গৃহত্যাগও তাহার জীবনে গভীরভাবে প্রভাব পড়িল। রাধারাণীর শরীরও ক্ষীণ হইয়া আসিল। এমতাবস্থায় এক মুসলমান পড়শী যাহার নাম ফকির আলী সেই মাসিমা রাধারানীর দেখাশুনার ভার নিল। আম, জাম কাঁঠাল কলা গাছ ঘেরা বাড়ির গোটা বাড়ির এবং মাসিমা রাধারানীর দায়িত্ব পুরোপুরি পড়িল ফকিরের উপরে। ছায়াসঙ্গী ফকির ও মাসিমাতে ভালোই চলছিল। বলা চলে কোন কিছুতে খামতি ছিল না। সবকিছু ভুলে রাধারানী আবার পুনরায় বাঁচার রসদ খুঁজে পেলেন। এই সময় রাধারানীর আরো সঙ্গী জুটিল যেটা হল ছয়-সাত বছরের ছোট্ট ফুটফুটে একটি ছেলে যার নাম সিরাজ। সিরাজ রাধারাণীকে দিদিমা বলিয়া ডাকে। রাধারাণী সিরাজের মিষ্টি খুনসুটিতে বেশ ভাল সময় কাটিতে লাগিল। প্রতিবছর পয়লা মাঘে রাধারানীর মা গৃবালা দেবীর বাৎসরিকে কতকিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ফুলকো লুচি নিরামিষ ফুলকপির তরকারি ও টমেটোর চাটনি সহযোগে সিরাজের দারুন প্রথমভোজ চলিত তাহার পরে অন্যান্যরা পাইতো। পরদিন সকালে আবার দিদিমা হাজির হতো সিরাজের বাড়িতে। তারপর গল্প হয়তো অবশেষে দিদিমা তাহাকে স্নান করাইয়া স্কুলে পাঠাইলো। দিনান্তে স্কুল থেকে সিরাজ আসিয়া আবার দিদিমার কাছ থেকে ঠাকুরমার ঝুলি, বোদ্ধ জাতক, আরব্য রজনীর গল্প শুনতো। এখানে দিদিমাও তার নিজের বাল্যকালের সেই পুতুল বরের স্বাদ পাইতো এবং যখন বনমালী বাবুর কথা তাহার মনে পড়িত তখন চোখের কোনা চিকচিক করে উঠিত। সিরাজ জিজ্ঞাসা করিত তুমি কাঁদিতেছো কেন গো, কারুর কথা কি মনে পড়েছে নাকি, আমি তোমাকে কোনরূপ ব্যথা দিয়াছি। দিদিমা অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিত না... রে না...রে বাদ দে চল দেখি কটা ফুল আনি, একটু পুজো দেব। ও এই কারনে তোমার ক্লেশ হইতেছে তাহলে তুমি বইস আমিই তোমার জন্য শিউলি, পলাশ, জবা, স্থলপদ্ম ফুল গাছ থেকে পাড়িয়া দিতাছি এই বলিয়া সিরাজ দিদিমার ফুলের সাজি লইয়া এক সাজি ফুল আনিয়া দিত। এরপর আবার সিরাজ বিদায় লইত। পরদিন আবার সকালে উঠিয়া দিদিমা সিরাজকে ডাকিয়া চা জলখাবার খাওয়াইয়া দশ কুড়ি আনা দিত। স্কুলে গিয়ে চিটকদম বা বরফ খাওয়ার জন্য। এইরূপে রাধারানী- সিরাজ ও ফকিরের সংসার চলিতে চলিতে একদিন রাধারানীর বড় ছেলে রবী তাহার মেম স্ত্রী ও পুত্র কন্যা লইয়া গ্রাম্যবাড়িতে ফিরিয়ে আসিল রাধারানী খুশিও হইল। ইহাতে ভালোবাসার ভাগ কমিল সিরাজের জন্য সে আর দিদিমার গৃহে উপস্থিত হয় না আর দিদিমাও একটু ব্যস্ত হইয়া পড়াতেও সিরাজ একটু মুখ ভার করিয়া বাড়িতে গুমড়ে ঠাই বসিয়া থাকে। অবশেষে সিরাজ পরদিন দিদিমার বাড়িতে গিয়া সাতসকালে দি...দি...মা, দি...দি...মা। কে...রে... তুই, কেন আমি সিরাজ। ও আয়, বোস, কিন্তু তুমি আগে বল আমার দিদিমা কোথায়? শোন, বেচারাম । কে বেচারাম? কেন তুই? না আমি বেচারাম না। আমি সিরাজ। আচ্ছা বেশ বল তোর কি চাই। কিছুই চাই না শুধু দিদিমাকে ডাকিয়া দাও। এরপর দিদিমা হেঁসেল থেকে বেরিয়ে সিরাজকে বলিল শোন শহর থেকে আমার ছেলে বৌমা ও নাতি নাতনি আসিয়াছে কিন্তু কাল চলিয়া যাইবে তারপর আমরা না হয় আগে রহমত আবার গল্প করিব। আচ্ছা বেশ আমি তাহলে স্কুলে চলিলাম, আচ্ছা যা বাবা। পরদিন সকালে রবি ও তার পরিবার সরকারি মোটর গাড়িতে চেপে শহরে চলে গেলেন। এরপর আবার দিদিমা সিরাজ ও ফকিরের সংসারে আনন্দ ফিরল কিন্তু দিদিমা বলিল কেন সিরাজ আমি আর বেশিদিন এখানে থাকিতে পারিব না কেননা আমার ছেলে এখান থেকে শহরে নিয়ে যাবে বলেছে। এরপর সিরাজ-দিদিমা ও ফকিরের সংসার চলতে থাকলেও কোথাও যেন একটুকরো বেদনার অব্যক্ত ব্যথা উদয়ে কিঞ্চিত ভয় বাঁধন আরও অটুট হইল। ইহার কিছুদিন পরে রবী রায় ব্যাঙ্কে খাতা খোলার নাম করে জাল দলিলে দিদিমার কাছ থেকে সমস্ত স্বাক্ষর করিয়া সম্পত্তি করে নেয় এবং দিদিমাকে নিজের

কাছে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে যাওয়ার দিনে এককোণে সিরাজ বসে বসে চোখের জল ফেলিতে লাগিল এমন সময় দিদিমা সিরাজকে বুকে জড়াইয়া ডুকরে কেঁদে উঠিল এবং বলল কাদিসনারে পাগল আমি আবার আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন। এর কিছুদিন পরে সরকারি ডাকঘর থেকে ছোট সিরাজের নামে একটি চিঠি এলো যেখানে লেখাছিল এখানে আসিয়া বাথরুমে পরিয়া আমার পা ভাঙ্গা আছে আমি তোদের ছাড়া খুব কষ্টে আছি। খুব দেখতে ইচ্ছে করছে যে তোদের। এরপর সিরাজ ও ফকির শহরে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর রবী রায়ের তেতলাবাড়ি খুঁজে পেল যাহার সামনে একটি সাদা কাপড়ে সিরাজের দিদিমার মৃতদেহ পড়ে আছে আর তাহার পাশে ঢাকা শ্মশান যাত্রার প্রস্তুতিপর্ব চলিতেছে।

সিরাজ দেখে কাঁদিতে লাগিল কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। অবশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের কাছে অল্পবিস্তর কলম পিষে একথা জানতে চাই যে—

"এইরকম হিন্দু-মুসলমান মিলনের লীলা ক্ষেত্রটি গ্রামবাংলায় ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে?"

Introducing Gobardanga Hindu College

Gobardanga Hindu College, currently situated at Gobardanga, North 24 Parganas district in West Bengal, is an institution to reckon with. Established in 1947, on the 27th day of November, the college has moved through diverse terrains of history, politics and culture. A few months after independent India was born, it is said that a number of eminent, inspired and energetic academicians moved from Daulatpur College (located in the Khulna district of present Bangladesh and once part of the Jessore district of undivided Bengal) to Gobardanga with the promise of spreading the light of knowledge therein. Very few prominent educational institutions were then found to exist in the neighbourhood of Gobardanga. The Khantura Boys' School was one such premiere institution. The notable teachers and scholars of Daulatpur College began taking their first classes in the premise of Khantura Boys' School. The science department (including a small laboratory and office) was set up in the charitable clinic of Harinarayan Rakshit. The journey thus began amidst crises but that was soon overcome.

The keenness of the educators urged various people from different castes and sects of the vicinity to come forward with their significant contributions. The Mukherjees of Gobardanga- the wealthy landlords donated part of the land on which the college stands today. Annada Prasanna Mukhopadhyay, the second eldest son of Sarada Prasanna Mukhopadhyay (belonging to the family of landlords) was extremely enthusiastic about learning. The college library today still bears testimony to this fact. About 10,000 books along with priceless wooden shelves and almirahs were donated by the family to the college. Here is indeed a rare archive of books

and journals, original newspaper clippings from the pre-independent era; grants and donations came from other sources. Certain eminent Brahmins appreciated the endeavour and created scope for further development in this field. The college received special grants and emoluments from the Tambouli community of Gobardanga. The Tamboulis were a group of small land owners in Gobardanga. They were also involved in trade and commercewith mainstream business centres in Kolkata. They yielded vast fortune and distributed a handsome part of it amongst the new learners.

Though there were only a few subjects taught in the initial phase of the college, today classes are held in about 23 subjects in Arts/Humanities,Science and Commerce streams. The departments of Bengali, Education and History have already introduced post-graduation courses in their respective subjects. A large number of students are therefore being benefitted. The Bengali Department has already introduced a postgraduation course in the subject and a large number of students are therefore being benefitted. Other departments have also expressed the desire to introduce PG course in the near future. Gobardanga Hindu College is one of those few colleges to have an adjoining B.Ed section in its vast campus in the district. Conventional subjects which have been present from the early years since the inception of the B.Ed department have been included along with other modern subjects as per the new curriculum of NCTE. Gobardanga Hindu College has changed and transformed from its older days with the passage of time. One of the significant features has been the gradual increase in the number of female students. Along with this is obviously the prominent rise in the number of lady teachers in the college. It is a matter of pride that the college has been able to contribute to and make a mark in the cause of woman's emancipation in a locality that is not fully urbanised.

Modernisation has provided scope for further research in the college premises. Many teachers are engaged in doctoral and post-doctoral research in various subjects. Modern classrooms, teaching aids and new gadgets facilitate the systems of teaching and learning most effectively. A lush green campus, eternal enthusiasm of all the members of the college,and past and present students add to the vision of learning in which tradition walks hand in hand with individual talent. Novelty is sought without sacrificing conventions as the institution marches ahead to strive towards excellence. It was awarded an "A" grade by NAAC in 2005& 2015. The Ministry of HRD, Govt. of India, has selected a handful of academic institutions to receive funds under RUSA scheme, of which our college is a proud receipent. The promises continue to extend far along the path in which unity plays its part. A long journey lies ahead for all and the desire to fulfil the myriad dreams remains eternally strong, for as Robert Browning put it: "A man's reachshould exceed his grasp or what's heaven for?"